দারসে কুরআন

৫

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন

৫ম খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

www.pathagar.com

দারসে কুরআন- ৫ম খন্ড

প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
মে - ২০১১ সাল
বৈশাখ - ১৪১৮ সন
রবিউস সানি -১৪৩২ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ তাবাস্‌সুম ও সাহাল
৩০, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	তাসনিয়া বই বিতন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আল কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার
আন্দোলনে যাঁরা জীবন দান করেছেন
তাঁদের শাহাদাত কামনায়।

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে, পারিবারীক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর করণীয় হলো আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের প্রকৃত বুঝ থাকা প্রয়োজন। আল-কুরআনের প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যেই আমি আল কুরআনের বাছাই করা কতকগুলো অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে **পঞ্চম খন্ড** প্রকাশ করা হলো এবং আগামীতে আরও খন্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে-যদি আল্লাহ্ আমাকে লিখার তাওফীক দান করেন।

আমি 'দারসে কুরআন' এর খন্ডগুলো ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লিখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআন প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লিখার বিশেষ বৈশিষ্ট

www.pathagar.com

হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন পঞ্চম খন্ড লিখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি ও পাঠক-পাঠীকা পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লিখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যদি ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিংবা কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লার কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য তুমি আমাকে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিও। আর সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ (দিবা-নৈশ)
দৌলতপুর, খুলনা।

তারিখ- ০১. ০৬. ২০১২

www.pathagar.com

সূচী পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

১. তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্মবাদ। (সূরা আল ইখলাস) -------- ০৭

২. দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফর থেকে
বাধা দানের নির্দেশ। (সূরা আল মুদ্দাস্‌সির-১-৭) -------- ৩০

৩. কথায় কাজে গরমিল বর্জন। (সূরা আস্ সফ- ১-৪) -------- ৫০

৪. হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ তা'লা। কর্মীদের সাথে
ভালো ব্যবহার এবং ত্রুটি মাফ করা। পরামর্শের ভিত্তিতে
সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকা ও আল্লাহর
উপর ভরসা করা। আল্লাহর সাহায্য থাকলে কোনো শক্তিই
বিজয়ী হতে পারবে না। (সূরা আলে ঈমরান- ১৫৬-১৬০) ----- ৬৪

৫. হকদারের আমানত ফেরৎ দেয়া। ন্যায়নীতির সাথে মিমাংসা করা।
আল্লাহ, রাসূল এবং আমীরের আনুগত্য করা। কোনো
বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের
নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়া। (সূরা আন্ নিসা- ৫৮-৫৯) ----- ৮৭

৬. মতোবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমাধানের উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহ।
কঠোর থেকে কঠোরতর পরীক্ষা দিয়েই মুমিনদের জান্নাতে
প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষা মোকাবেলার মাধ্যম হলো
সবর ও আল্লাহর সাহায্য। (সূরা-আল বাকারা - ২১৩-২১৪) -- ১১২

৭. রাসূলুলাহ (সঃ) সত্য নবী হওয়া, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ
ওহী তথা আল কুরআনে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ
না থাকা এবং নবী করীমের (সঃ) জিবরাঈল কে আসল
রূপে স্বচক্ষে দেখা প্রসঙ্গে। (সূরা-আন্ নাজম -১-১৫) ------ ১৩৪

www.pathagar.com

এক

তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্মবাদ

সূরা আল ইখলাস- ১১২

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ○ اَللهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○

وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) (হে মুহাম্মদ) আপনি বলুন ঃ তিনিই আল্লাহ্ একক-অদ্বিতীয়। (২) আল্লাহ্ কারো-ই মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। (৩) তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। (৪) এবং তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ-ই নেই।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ قُلْ - বলো/বলুন। هُوَ - তিনি/তিনিই। اَحَدٌ- একক/অদ্বিতীয়। اَلصَّمَدُ - মুখাপেক্ষীহীন। لَمْ يَلِدْ - তাঁর কোনো সন্তান নেই/তিনি কাউকে জন্ম দেননি। وَ - এবং। لَمْ يُوْلَدْ - তিনি কারো সন্তান নন/তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি। وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ - এবং নেই তাঁর। كُفُوًا - সমতুল্য/সমকক্ষ। اَحَدٌ - কেউ/কেউই/দ্বিতীয় কেউ।

সম্মোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয়/ দ্বীনদার/ ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা/ বোনেরা/ ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ্।

আমি আপনাদের সামনে/ খিদমতে পবিত্র আল কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ছোট্ট একটি সূরা তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে এই ছোট্ট অথচ ব্যাপক অর্থবোধক ও ব্যাখ্যা সম্বলিত সূরাটির দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা-তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ"।

সূরার নামকরণ ঃ আলোচ্য সূরাটির নাম "আল ইখলাস"। এর অর্থ- খালেস বা নির্ভেজাল-একনিষ্ঠ। পবিত্র আল কুরআনের অন্যান্য সূরার নামকরণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে বেছে নিয়ে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে। কিন্তু এই সূরাটির নামকরণের ক্ষেত্রে সূরার মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দকে গ্রহণ করা হয়নি। বরং সূরার শিরোনাম হিসেবে বিশেষ একটি পৃথক শব্দকে বেছে নেয়া হয়েছে। এই সূরার আলোচ্য বিষয় ও অন্তরনিহিত ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এই সূরার পুরোটাই খালেস, নির্ভেজাল, একনিষ্ঠ তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে কেউ-ই এই সূরাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে উহার মূল কথার উপর ঈমান আনবে, সে অবশ্যই শিরক থেকে মুক্তি লাভ করবে।

সূরাটি নাযিলের কারণ ও সময়কাল ঃ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এই বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সূরাটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে যেসব বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা রয়েছে তার প্রেক্ষিতেই বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে সূরাটি নাযিল সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করা হলো ঃ

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ) কে বললো, আল্লাহর বংশ-তালিকা আমাদের বলুন, তখন এই সুরাটি নাযিল হয়। (তাবারাণী)

অন্য এক হাদীসে আবুল আলীয়া হযরত উবাই ইবনে কা'বের সূত্রে বলেছেন, মুশরিকরা নবী করীম (সঃ) কে বললো, আপনার মা'বুদের বংশ-তালিকা আমাদের বলুন। তখন আল্লাহ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন। (আহমদ, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে জরীর, তিরমিযী, বুখারী, হাকেম, বায়হাকী)

অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে হয়রত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। একজন আরব লোক (কোনো কোনো বর্ণনায় লোকেরা) নবী করীম (সঃ) কে বললো, আপনার রব-এর বংশ পরিচয় আমাদেরকে বলুন, তখন আল্লাহ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন।

(আবু ইয়ালা, ইবনু জরীর, ইবনুল মুনযির, তাবারাণী, বায়হাকী)

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে ইকরামা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। ইহুদীদের একদল লোক রাসূলে করীম (সঃ) এর নিকট হাজির হলো। কা'ব ইবনে আশরাফ ও হাই ইবনে আখতারও এদের মধ্যে ছিলো। তারা বললো, হে মুহাম্মদ! বলুন, আপনার সেই রব কি রকম যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন।

(ইবনে আবু হাতিম, ইবনে আদী, বায়হাকী)

এসব বর্ণনা ছাড়াও ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর তাফসীরে সূরা ইখলাস নাযিলের আরও কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেমন, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, খায়বরের কতিপয় ইহুদী রাসূলে করীম (সঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবুল কাসিম! ফিরিশতাদেরকে আবরণের নূর হতে, আদমকে মাটির পচাগলা গাড়া হতে, ইবলীসকে অগ্নিশিখা হতে, আকাশমন্ডলিকে ধোয়া হতে এবং পৃথিবীকে পানির ফেনা হতে বানিয়েছেন। এখন আপনি আপনার আল্লাহ্ সম্পর্কে বলুন, তাঁকে কি দিয়ে বানানো হয়েছে ? নবী করীম (সঃ) তাদের একথার কোনো জবাব দিলেন না। পরে জিবরাঈল (আঃ) আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! লোকদেরকে বলে দিন- هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (তিনি আল্লাহ একক)

অন্য হাদীসে আমর ইবনে তোফাইল নবী করীম (সঃ) কে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে কোন জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন ? নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহ তা'লার দিকে। আমের বললো, আচ্ছা তাহলে তাঁর বিবরণ আমাকে বলুন, তিনি কি সোনা না রূপা দ্বারা তৈরী, না লোহার বানানো ? এর জবাবে এই সূরাটি নাযিল হয়।

দহ্হাক কাতাদাহ ও মুকাতিল বর্ণনা করেন, ইহুদীদের কিছু আলিম নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনার আল্লাহর বিবরণ আমাদেরকে বলুন, আমরা হয়তো আপনার প্রতি ঈমান আনতেও পারি। আল্লাহ্ তাওরাতে নিজের পরিচিতি নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরী ? কোন্ পদার্থের-সোনা দ্বারা না তামা, পিতল, লোহা কিংবা রূপা দ্বারা তৈরী ? আর তিনি কি খাবার খান ? তিনি কি দুনিয়াকে কারো কাছ থেকে উত্তরাধিরাকার সূত্রে পেয়েছেন ? এরপর তাঁর উত্তরাধিকার কে হবেন ? এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ তা'লা এই সূরাটি নাযিল করেন।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল সাতজন পাদ্রীসহ নবী করীম (সঃ) নিকট হাজির হলো। তারা নবী করীম (সঃ) কে বললো, আমাদের বলুন, আপনার রব কি রকমের ? তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরী ? নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার রব কোনো জিনিস দ্বারা তৈরী নন। তিনি সব জিনিস হতে স্বতন্ত্র। এই সময় আল্লাহ তা'লা এ সূরাটি নাযিল করেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম (সঃ) মক্কার কুরাইশ কাফির, মুশরিক এবং মদীনার ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্যদের নিকট এক আল্লাহর বন্দেগী করার দাওয়াত দিয়েছেন। আর তখনই তারা আল্লাহর প্রকৃত রূপ ও পরিচয় জানতে চেয়েছে। আর সবক্ষেত্রেই নবী করীম (সঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সূরা ইখলাস পেশ করেছেন। প্রথমতঃ মক্কার কুরাইশ বংশের মুশরিকরা তাঁর নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলো। তাদের জবাব স্বরূপ এই সূরাটি নাযিল হয়। দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (সঃ) যখন হিজরত করে মদিনায় চলে যান, তখন কখনও ইহুদীরা আবার কখনও খৃষ্টানরা এবং কখনও আরবের অন্যান্য লোকেরা নবী করীম (সঃ) এর নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করেছে। আর প্রত্যেক বারই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সূরাটি পেশ করারই নিদের্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং উপরের হদীসের বর্ণনা থেকে কোনো বৈপরিত্র পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত বা সূরা একেবারেই নাযিল হয়। আল্লাহর নবী যখন একই প্রশ্নের বা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই আল্লাহ তা'লা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে সেই আয়াত বা সূরার কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অতএব সূরা ইখলাস নাযিল সম্পর্কে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, এই সূরাটি সর্বপ্রথম মক্কা শরীফে নাযিল হয়। শুধু তাই নয় বরং এর বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এটা মক্কার প্রথম যুগেই নাযিল হয়। সুতরাং সূরাটি মাক্কী।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ঃ এই সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তবই হলো নির্ভেজাল তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ত্ববাদ। কেননা, তৎকালীন মক্কার লোকদের ধর্মীয় অনুভূতিই ছিলো এই যে, যার ইবাদত করা হবে তার দেহ বা আকার থাকতে হবে। মানুষের মতো স্বামী-স্ত্রী থাকতে হবে। তাদের যথারীতি বংশধারা চলতে থাকবে। এভাবে তাদের পূজকদের

www.pathagar.com

সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা বদ্ধমূল ছিলো। তৎকালীন মূর্তীপূজারী মুশরিক ছাড়াও অগ্নিপূজক মাজুশী ও নক্ষত্রপূজক সাবেয়ীও ছিলো। এরূপ অবস্থায় লোকদেরকে যখন এক ও লা-শারীক আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার আহবান জানানো হলো, তখন তাদের মনে নানান প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণার বিপরীত এই আহবানে তাদের মনে সেই একক খোদার পরিচয় জানার বিষয়টি তীব্র হয়ে উঠলো। আল্লাহ তা'লা তাদের নানান ধারণা ও প্রশ্নের জবাবে মাত্র কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দবিশিষ্ট একটি ছোট্ট সূরা নাযিল করে আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করলেন। আল কুরআনের এই জবাবে আল্লাহ সম্পর্কে সকল প্রকার মুশরিকী ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার মুলোৎপাটন করা হয়েছে। এর দ্বারা শিরকী আকীদার চির অবসান ঘটানো হয়েছে। এই সূরার দ্বারা আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টিকূলের মধ্যে কারও কোনো গুণের বিন্দুমাত্র মিল হবার কোনো-ই সুযোগ থাকলো না।

সূরাটির বিশেষ ফযিলত ও গুরুত্ব ঃ নবী করীম (সঃ) এর নিকট এই সূরাটির অত্যধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিলো। তিনি মুসলিমদেরকে নানাভাবে এর গুরুত্ব অনুভব করাতে চেষ্টা করতেন। তাঁর কামনা ছিলো, মুসলমানরা এই সূরাটি খুব বেশী করে পাঠ করুক এবং জনগণের মধ্যে একে খুব বেশী করে প্রচার করুক। কেননা, এই সূরাটিতে ইসলামের মৌলিক আকিদা-তাওহীদ সম্পর্কে মাত্র চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে বলে দেয়া হয়েছে। এর বিশেষ মুজিযা হলো- এই বাক্য কয়টি শুনা মাত্রই তা মানুষের মনে স্থায়ী ও সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং অতি সহজেই মুখস্ত করা যায়।

সূরা ইখলাসের ফযিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সহীহুল বুখারীর তাওহীদ অধ্যায়ে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) কোনো একজনের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবী করীম (সঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! যাঁকে আপনি আমাদের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন তিনি প্রত্যেক নামাযে কিরআতের সাথে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরাটি পাঠ করতেন। নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে বললেন ঃ সে কেন এরূপ করতো তা তোমরা

তাঁকে জিজ্ঞেস করোতো ? তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, এই সূরা আল্লাহ রহমানুর রহীমের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরা পড়তে আমি খুব ভালোবাসি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।

(ইবনে কাসীর)

অনুরূপ সহীহুল বুখারীর সালাত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। একজন আনসারী মসজিদে কুবা-র ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠের পরই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তারপর কুরআনের অন্য অংশ পাঠ করতেন। মুক্তাদীরা একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সুরা ইখলাস পাঠ করার পর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে পাঠ করেন, ব্যাপারটা কি ? হয় শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করুন। আনসারী ইমাম জবাব দিলেন,আমি যেমন করছি তেমনিই করবো, তোমাদের ইচ্ছা হলে আমাকে ইমাম রাখো, না হলে বলো, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিচ্ছি। মুসল্লীরা দেখলেন যে, এ তো মুশকিল ব্যাপার! কারণ সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কারো ইমামতি মেনে নিতে পারলেন না। একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে আসলে মুসল্লীরা তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মুসল্লীদের কথা মানো না কেন? প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ইখলাস পড়ো কেন ? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, এ সূরার প্রতি তোমার আসক্তি ও ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। (ইবনে কাসীর)

মুসনাদ-ই আহমদ ও জামে' আত্ তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরাটিকে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেন, তোমার এ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (ইবনে কাসীর)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে । রাসুলুল্লাহ (সঃ)

www.pathagar.com

সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কি প্রত্যেকেই কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে না! সাহাবীদের কাছে এটা খুবই কষ্টসাধ্য মনে হলো। তাই তাঁরা বলেলন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা আছে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেন, জেনে রেখো قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। (সহীহুল বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোথাও হতে আসলেন, তাঁর সাথে হযরত আবু হুরাইরাও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন লোককে এই সূরাটি পাঠ করতে শুনে বললেনঃ 'ওয়াজিব হয়ে গেছে'। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে ? তিনি উত্তরে বললেন, জান্নাত (ওয়াজিব হয়ে গেছে)। (জামে' আত্ তিরমিযী, নাসায়ী)

সূরা ইখলাসের ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে এভাবে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা ইখলাসের মূল ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে সূরা সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের খিদমতে পেশ করা হলো- যা দারস বুঝার জন্য বেশ সহায়ক হবে। এখন আমি ধারাবাহিকভাবে সূরাটির ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরার প্রথমেই মুশরিকদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (সঃ) কে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ هُوَاللهُ اَحَدٌ **(হে মুহাম্মদ সঃ) বলুন, আল্লাহ একক-অদ্বিতীয়।**

এই সূরাটি নাযিলের কারণ সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইকরামা (রহঃ) বলেন যে, ইহুদীরা বলতো- 'আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়ের (আঃ) এর উপাসনা করি'। আর খৃষ্টানরা বলতো- 'আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ঈসা (আঃ) এর উপাসনা করি'। মাজুসীরা বলতো- 'আমরা চন্দ্র-সূর্যের উপাসনা করি।' আবার মুশরিকরা বলতো- 'আমরা দেব-দেবীর পূজা করি'। আল্লাহ তা'লা তখন এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

قُلْ ঃ 'বলুন'-শব্দটি রিসালাত ও নবুয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথমে

www.pathagar.com

তো নবী করীম (সঃ) এর প্রতি। কেননা, আপনার আল্লাহ্ কে-কেমন ও কি প্রকৃতির এবং তাঁর বংশ-পরিচয় বা কি, এই প্রশ্নতো তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। আর এই প্রশ্নের জবাব স্বরূপ পরবর্তী কথা বলার জন্য তাঁকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহর এই নির্দেশ মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর পরে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, এই সূরাটিতে নবী করীম (সঃ) কে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ সম্পর্কে যে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ঈমানের দাবীদার প্রত্যেক মুমিনের-ই উচিত সেই কথা নিজে দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং সে ভাবেই বলা বা জবাব দেয়া।

আল্লাহর নবীসহ প্রত্যেক মুমিনকে 'আল্লাহ' সম্পর্কে বলার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

هُوَاللهُ -তিনি আল্লাহ। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সকল গুণের উৎস ও সকল দোষ হতে পবিত্র। তিনি তো এমন এক সত্তা যিনি আমাদের সকলের-ই রব-প্রতিপালক। এটা হলো- প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব।

اَللهُ -নামের তাৎপর্য ঃ বিশ্ব জাহানের সৃষ্টি কর্তার জাত নাম হলো-اَللهُ (আল্লাহ)। আল্লাহর যে নিরানব্বইটি নাম রয়েছে তার মধ্যে 'আল্লাহ' বাদ দিয়ে আর সবগুলোই 'সিফাতি' বা গুণবাচক নাম। আর 'আল্লাহ' নামটি আদিকাল থেকে সকলের কাছেই পরিচিত। আল্লাহর নবী (সঃ) সকল প্রকার পূজক, উপাস্য ও দেব-দেবীর উপাস্যকে বাদ দিয়ে এককভাবে যে রবকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন তা কোনো নতুন নাম ছিলো না। বরং 'আল্লাহ' শব্দটি আরবদের নিকট খুব-ই পরিচিত ছিলো। প্রাচীন কাল থেকেই তারা বিশ্বজাহানের সৃষ্টি কর্তাকে বুঝানোর জন্য এই 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করে এসেছে। তাদের অন্য কোনো উপাস্যকে বুঝানোর জন্য তাদের নিকট প্রচলিত শব্দ ছিলো 'ইলাহ'। 'আল্লাহ' সম্পর্কে তাদের ধারণা ও বিশ্বাস এমন ছিলো যে, যখন আবরাহা বাদশাহ কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য মক্কা আক্রমন করেছিলো, তখন তাদের মুখ দিয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিই উচ্চারিত হয়েছিলো। অথচ সেই

সময় কা'বা ঘরের মধ্যে তাদের উপাসনার জন্য ৩৬০ টি মূর্তি বিদ্যমান ছিলো। অথচ তারা কা'বা ঘরকে রক্ষার জন্য তাদের এসব দেব-দেবীকে না ডেকে আল্লাহ-কেই ডেকেছিলো। তাদের মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই যে, এ ঘর একমাত্র রক্ষা করতে পারবে 'আল্লাহ', অন্য কেউ-ই এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাছাড়া কা'বা ঘরের মধ্যে ৩৬০ টি মূর্তি বা প্রতিমা থাকার পরও ওই ঘরের নাম তাদের মা'বুদ সম্পর্কে পরিচিত শব্দ 'বায়তুল আলেহা' বা 'উপাস্যের ঘর' ব্যবহার করতো না, বরং তারা 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলেই অভিহিত করতো।

আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের যে ধারণা ও বিশ্বাস ছিলো, তা পবিত্র আল কুরআনের অসংখ্য যায়গায় উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্য হতে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সূরা যুখরুফ-এ বলা হয়েছে-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

"(হে নবী!) আপনি যদি এই লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে ? তা হলে তারা অবশ্যই বলবে যে, নিশ্চয় আল্লাহই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে।" (আয়াত নং-৮৭)

সূরা আনকাবুত-এ বলা হয়েছে-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ م بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

"(হে নবী!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে ? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসা করেন, আসমান

www.pathagar.com

হতে কে পানি বর্ষণ করেছে এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে পুণর্জীবিত করেছে ? তা হলে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কিন্তু তার আধিকাংশই নির্বোধ। (আয়াত নং-৬১-৬৩)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে-

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُالْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

"(হে নবী!) এদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে কে রিযিক দান করে ? তোমাদের এই শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বের অধীনে ? কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করে ? আর কে এই বিশ্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে ? এরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ'। অতএব তাদেরকে বলুন, এরপরও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না ?" (আয়াত নং-৩১)

সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে-

وَاِذَامَسَّكُمُ الضُّرُّفِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآاِيَّاهُ ج فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا

"সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর বিপদ আসে। তখন সেই এক আল্লাহ ছাড়া আর যাকে যাকে তোমরা ডাকো, তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (আয়াত-৬৭)

উপরোক্ত আয়াতসমুহের প্রতি দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যায় যে, মক্কার লোকেরা যখন নবীজিকে জিজ্ঞেস করলো-তোমার রব কে, তিনি কি রকম, হে মুহাম্মদ! যাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য তুমি আমাদেরকে ডাকছো? তখন তাদের উত্তর দেয়া হলো- هُوَاللهُ "তিনি তো আল্লাহ"। অর্থাৎ মুশরিকরা পূর্ব থেকেই একক সত্তা যেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতো এবং মানতো, তাদেরকে তো কেবল সেই আল্লাহর কথা-ই বলা হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যেসব প্রশ্ন ছিলো তার উত্তর তো এছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না।

www.pathagar.com

তারপর পরবর্তীতে সকলেরই পরিচিত একক সত্ত্বা 'আল্লাহর' একত্ববাদের প্রথম ঘোষণা হলো-

أَحَدٌ অর্থ- একক। কুরআন মজিদ নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবী ভাষায় أَحَدٌ শব্দটি গুণবাচক হিসেবে কোনো জিনিস বা কোনো ব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয়নি। আল কুরআন নাযিলের পর এই أَحَدٌ শব্দটি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হতে শুরু করে। শব্দটির এই অস্বাভাবিক ব্যবহার হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'একক' ও 'অনন্য' হওয়ার গুণটি কেবলমাত্র এক আল্লাহর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বিশ্বজাহানের অন্য কোনো ব্যক্তি বা জিনিস-ই এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার অধিকার রাখে না। কেবলমাত্র তিনিই এক-একক ও অনন্য, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই-বিকল্প কোনো কিছুই নেই।

অন্য দিকে মক্কার মুশরিক ও মদীনার 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী-খৃষ্টানরা নবী করীম (সঃ) কে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করতো, সেই দৃষ্টিতে هُوَ اللهُ বলার পর أَحَدٌ বলে তাদের প্রশ্নাবলীর অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে উত্তর দেয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার একত্বের অর্থ হচ্ছে, তাঁর অস্তিত্বে তিনি একা। তাঁর একত্বের এই অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়, তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুরই কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তাঁরই দান। তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করে এবং নিজেদের অস্তিত্বের ধারণাও তাঁর মূল অস্তিত্ব থেকে গ্রহণ করে।

সুতরাং এই বিশ্ব জগতের সত্যিকার ও স্থায়ী যদি কর্তৃত্ব থেকে থাকে তা আল্লাহ তা'লার-ই আছে, অন্য কারো নয়। এ থেকে একথা যানা যায় যে, এই সূরায় বর্ণিত আকীদায় মানুষের বিশ্বাসগত আকীদা ও তাঁর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা এ উভয়টাই প্রমাণ করে।

'ওলুহিয়াত' বা আল্লাহর একাত্ববাদ সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনের কতিপয় আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন- সূরা বাকারা'য় বলা হয়েছে- وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

www.pathagar.com

"তোমাদের ইলাহ- মা'বুদ এক ও একক ইলাহ। সেই রহমান ও রহীম ইলাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই।" (আয়াত নং-১৬৩)

সূরা আলে ইমরান-এ বলা হয়েছে-

شَهِدَاللهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لا وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوالْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ

"আল্লাহ স্বাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। ফিরিশতাগণ এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকেরাও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আয়াত নং-১৮) একই সূরায় বলা হয়েছে-

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; আর আল্লাহর কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে।" (আয়াত নং-১০৯)

সূরা আশ্ শুরা-য় বলা হয়েছে-

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ وَهُوَالْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।" (আয়াত নং-৪)

সূরা আন্ নূর-এ বলা হয়েছে-

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ج وَاِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ

"আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর-ই এবং তাঁর-ই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।" (আয়াত নং-৪২)

সূরা আস্ সাফ্ফাত-এ বলা হয়েছে-

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

"নিশ্চয়-ই তোমাদের ইলাহ এক-একক। যিনি আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রক্ষক এবং রক্ষক পূর্বদিগন্তের।"(আয়াত-৪-৫)

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিশ্বজাহানের ইলাহ, সংরক্ষক, নিয়ন্ত্রক, প্রতিপালক ও সার্বভৌমত্বের মালিক এক আল্লাহর কথাই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাওহীদপন্থী একজন মুমিন যেমন নিজের মন-মগজে সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর একাত্ববাদকে লালন করবে, তেমনি যখন-ই কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর একাত্ববাদের বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তখন-ই তার প্রথম জবাবই হবে اَللّٰهُ اَحَدٌ আল্লাহ একক-অদ্বিতীয়।

তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ববাদের দ্বিতীয় ঘোষণা হলো-

اَللّٰهُ الصَّمَدُ - আল্লাহ্ কারো-ই মুখাপেক্ষী নন, সব-ই তাঁর মুখাপেক্ষী।

صَمَدٌ -মূল শব্দ। ص- م- د এর মূল অক্ষর। এটি একটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থের তাৎপর্য নিম্নে বিভিন্ন জনের উক্তিসহ বর্ণনা করা হলো ঃ

হযরত আলী, ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যার উপরে কেউ নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু ওয়ায়িল শরীক ইবনে সালামা (রাঃ) বলেছেন, صَمَدٌ (সামাদ) সেই সরদার-সমাজপতি যার নেতৃত্ব ও প্রাধান্য পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাসের অপর এক বক্তব্য হলো- صَمَدٌ (সামাদ) সেই, যার নিকট কোনো প্রকার বিপদ-মুসীবত দেখা দিলে সাহায্য চাওয়া হয়। তাঁর আরো একটি উক্তি হলো- যে সরদার-সমাজপতি তার নিজের সরদারী ও প্রাধান্যে, স্বীয় মর্যাদায় নিজের মাহাত্মে ও বড়ত্বে, নিজের ধৈর্য ও সহিষ্ণুওতায়, স্বীয় জ্ঞানে ও নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মকূশলতায় পরিপূর্ণ।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যে কারো মুখাপেক্ষী নয়, সবাই তার মুখাপেক্ষী।

www.pathagar.com

হযরত ইকরামার আরো একটি উক্তি হলো, صَمَدٌ (সামাদ) তা, যার মধ্য হতে কোনো জিনিস কখনও বের হয়নি, বের হয় না। সে খায় না, পানও করে না। অর্থাৎ যার পেট নেই।

সুদ্দী বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) অর্থ-পার্থিব জিনিসগুলি পাবার জন্য যার দিকে তাকানো হয়। বিপদের সাহায্যের জন্য যার প্রতি আশা করা হয়।

সায়ী'দ ইবনে জুবাইর বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যে নিজের সব গুণ ও কাজে পরিপূর্ণ।

রুবাই ইবনে আনাস বলেন, যার উপর কোনো বিপদ-আপদ আসে না, সে صَمَدٌ (সামাদ)।

মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) সেই, যার কোনো দোষ-ত্রুটি নেই।

ইবনে কাইসান বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যার গুণে অন্য কেউ গুণান্বিত হতে পারে না।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) অর্থ- যে চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অশেষ।

মুররাতুল হামাদানীর অন্য একটি বক্তব্য হলো, صَمَدٌ (সামাদ) সে, যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা ইচ্ছা ফায়সালা করে, যে কাজ ইচ্ছা করে। তার নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও ফয়সালার উপর পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই।

ইবরাহীম নখয়ী' বলেন, صَمَدٌ (সামাদ) হলো সে, যার দিকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে ফিরে তাকায়; আশা পোষণ করে। (তাফহীমুল কুরআন)

এভাবে اَللّٰهُ الصَّمَدُ এর বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থ করেছেন। সবগুলো অর্থ যদি সমন্বয় করে এক কথায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায়- 'আল্লাহ কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।'

www.pathagar.com

বিবেচ্য বিষয় ঃ আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের প্রশ্নের জবাবে সূরার প্রথম বাক্যে اَللّٰهُ اَحَدٌ এ-اَحَدٌ শব্দের প্রথমে ال ছাড়া কেন বলা হলো, আর দ্বিতীয় বাক্যে اَللّٰهُ الصَّمَدُ -এ- صَمَدُ এ ال দিয়ে কেন বলা হলো, এবং এ বলার কারণ কি ? তা এখন বিবেচনা করতে হবে। এর বিবেচ্য বিষয় হলো - اَحَدٌ শব্দ সম্পর্কে আমরা পূর্বে ব্যাখ্যায় বলেছি যে, এটা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। অন্য কারো জন্য কখনো ব্যবহৃত হয় না এবং ব্যবহারও করা হতো না। এ কারণে اَحَدٌ শব্দটি ال ছাড়াই نَكِرَةٌ (নাকেরাহ) বা অনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু صَمَدُ (সামাদ) শব্দটি সৃষ্টির যে কোনো জিনিস বা ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং হতে পারে। এই জন্য اَللّٰهُ صَمَدُ (আল্লাহু সামাদ) এর পরিবর্তে صَمَدُ এ- ال সংযুক্ত করে اَللّٰهُ الصَّمَدُ (আল্লাহুস সামাদ) নির্দিষ্ট শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আসল ও প্রকৃত صَمَدُ (সামাদ) হলো আল্লাহ তা'লা, তিনি ছাড়া আর কেউ নয়। সৃষ্টির কোনো জিনিস বা অন্য কেউ صَمَدُ (সামাদ) যদি হয়ও, তবে তা কেবলমাত্র কোনো একটি দিক দিয়ে হবে, অন্য সবদিক দিয়ে হবে না, হতেও পারে না। কেননা, তা ধ্বংসশীল বা মরণশীল চিরস্থায়ী ও শাশ্বত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তিনি সবগুণে গুণান্বিত। বিশ্বজগত তার মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং اَلصَّمَدُ এই কারণে যে, তিনি একাই মা'বুদ অন্য কেউ মা'বুদ হতে পারে না। বরং অন্যরা সবাই আ'বদ। অতএব মানুষ যদি কারো ইবাদত-আরাধনা করতে চায়, তবে আল্লাহর করবে অন্য কারো করবে না-করতে পারে না। "আশরাফুল মাখলুকাত" বা "সৃষ্টির সেরা" মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা শোভা পায় না এবং মানুষের জন্য তা মর্যাদাপূর্ণও নয়।

www.pathagar.com

তাওহীদ বা আল্লাহ তা'লার একাত্ববাদ সম্পর্কে তৃতীয় আকিদা বা বিশ্বাস হলো- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।

মুশরিকদের আল্লাহর বংশ সম্পর্কে এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের আল্লাহর সন্তান সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিলো, তার উত্তরে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহর কোনো সন্তান নেই অর্থাৎ তিনি কাউকে জন্ম দেননি, অপর পক্ষে তিনিও কারো সন্তান নন অর্থাৎ তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি।

মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিলো, তাদের উপাস্যদের মতো আল্লাহও বুঝি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠিত হবে, সন্তানের জন্ম দেবে, ধারাবাহিকভাবে বংশধারা চলতে থাকবে। তাদের এ ধারণা মূলতঃ জাহিলী ধারণা, ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। আরবদের এরূপ বিশ্বাসের কথা পবিত্র আল কুরআনেও বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ফিরিশতাদের আল্লাহর কন্যা মনে করতো। আবার কোনো কোনো নবী রাসূলকেও আল্লাহর পুত্র মনে করতো (নাউযুবিল্লাহ)। যেমন, ইহুদীরা ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) দাবী করতো এবং খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) বলে মনে করতো। মহান আল্লাহ তা'লা তাদের এ দাবী বা বিশ্বাসকে সূরা ইখলাস নাযিল করে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন যে- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।

মহান আল্লাহ তা'লা তাদের এই শিরকী আকিদার উত্তর সূরা ইখলাস নাযিল করে তীব্র ও অকাট্য প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি ররং আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এ কথার বারবার উল্লেখ করেছেন, যাতে করে তাওহীদি আকীদার উপর সমাচ্ছন্ন অমূলক ধারণার সব অন্ধকার চিরতরে দূর হয়ে যায় এবং প্রকৃত বিষয় মানুষের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে এই পর্যায়ের কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো।

যেমন, সূরা আন নিসা'য় মহান আল্লাহ্ বলেন-

اِنَّمَااللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط

"আল্লাহ তো একমাত্র মা'বুদ। তাঁর কোনো সন্তান হবে- এ হতে তিনি পবিত্র। যা কিছু আকাশ জগতে আছে, আর যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তা সব-ই তাঁরই মালিকানাধীন।" (আয়াত নং-১৭১)

অনুরূপ সূরা আস্ সাফ্ফাত-এ বলা হয়েছে-

اَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ٥ وَلَدَاللّٰهُ لا وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

"জেনে রাখো, এই লোকেরা নিজেদের মনগড়া কল্পনা হিসেবেই বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে। প্রকৃত কথা এই যে,এই লোকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (আয়াত নং–১৫১-১৫২)

সূরা আনয়া'ম-এ মহান আল্লাহ্ বলেন-

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

"তিনি তো আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, কি করে তাঁর সন্তান হতে পারে? তাঁর তো স্ত্রী নেই, সকল জিনিসতো তিনিই সৃষ্টি করেছেন।"(আয়াত -১০১)

সূরা আম্বিয়া-য় মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

"আর এই লোকেরা বলে, রহমান আল্লাহ কাওকেউ পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি মহান পবিত্র। (যাকে তাঁর সন্তান বলে) তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দাহ মাত্র।" (আয়াত নং-২৬)

সূরা মু'মিনুন-এ মহান আল্লাহ্ বলেন-

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ -

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ কাওকেউ পুত্র বানান নি। আর অন্য কোনো ইলাহ্ও তাঁর সাথে নেই।" (আয়াত নং-৯১)

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কষ্টদায়ক কথা শুনে এতো বেশী ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই। মানুষ বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে, তবুও তিনি তাকে অন্ন দান করেন, স্বাস্থ্য ও সুস্থ্তা দান করেন।" (সহীহুল বুখারী)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে এবং হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিস্কার। যারা আল্লাহ্র পুত্র-সন্তান আছে, কিংবা তিনি কোনো পালকপুত্র গ্রহণ করেছেন বলে মনে করে ও এ ধরণের আকীদা পোষণ করে, এসব আয়াত ও হাদীস তাদের এই ধারণা এবং আকীদার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তাদের এই ধারণা ও আকীদা যে ভুল ও ভিত্তিহীন তাও অকাট্য দলিল এবং যুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য করে তুলেছে। বর্ণিত এসব আয়াত এবং আরোও অন্যান্য আয়াত সূরা ইখলাসের لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এই বক্তব্যকে মজবুত ও স্পষ্ট করে তুলেছে।

তাওহীদ বা আল্লাহ্র একাত্ববাদের চতুর্থ আকীদা বা বিশ্বাস হলো -

وَلَمْ يَكُنْ اللهُ كُفُوًا اَحَدٌ-আর তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ-ই নেই।

كُفُوٌ এর অর্থ হলো- সমতুল্য, সমকক্ষ, সহযোগী, সমমর্যাদা সম্পন্ন, ক্ষমতার সমান অধিকারী ইত্যাদি। মুসলিম সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে كُفُوًا (কুফু) শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং এই শব্দটি খুবই সুপরিচিত। এর অর্থ হলো, বর ও কনের সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে সামঞ্জস্যতা বা সমকক্ষতা। কাজেই এই আয়াতটির অর্থ হলো, গোটা বিশ্ব জাহানে আল্লাহর মতো গুণাবলীতে তাঁর সমকক্ষ, কাজ ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাঁর সমান, কোনো দিক দিয়েই বিন্দুপরিমাণ সমকক্ষ ও সমমর্যদার কেউ নেই, কেউ কোনো দিন ছিলো না, কেউ কখনো হতে পারে না এবং কোনো দিন হতেও পারবে না।

এই সূরাটি তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের ইসলামী আকীদার স্বীকৃতি প্রদান করে। আর 'সূরা কাফিরূন' তাওহীদ ও শিরকের আকিদার মাঝে

কোনো প্রকার সামঞ্জস্য ও মিলমিশকে প্রত্যাখান করে। এই উভয় সূরার মাঝেই তাওহীদে বিশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন দু'টি দিক বর্ণিত ও পরিস্ফুটিত হয়ে আছে।

সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের দু' রাকায়াত সুন্নত নামাযে অর্থাৎ প্রথম রাকায়াতে 'সূরা কাফিরূন' এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে 'সূরা ইখলাস' এই দুই সূরা পড়ে দিনের সূচনা করতেন। এভাবে শুরু করার একটা গভীর ও উঁচুমানের উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো।

যারা সূরা ইখলাসে বর্ণিত আকীদার বিপরীত আকীদা পোষণ করবে তারা শিরকে লিপ্ত হবে। আর শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ الْجَنَّةَ

"আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।"

মহান আল্লাহ তা'লা বিশ্ব মানব সন্তানদেরকে লোকমানের ঘটনাকে উল্লেখ করে শিক্ষা দিচ্ছেন-

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"স্মরণ করো, যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মস্ত বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান-১৩)

আল্লাহর নবীকেও শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"(হে নবী!) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বের (নবীদের) প্রতি অবশ্যই ওহী নাযিল করা হয়েছে। যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক করেন, তবে আপনার আ'মল বিফল হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে গণ্য হবেন।" (সূরা যুমার-৬৫)

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দু'টি বিষয় অপর দু'টি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হুজুর সে দু'টি বিষয় কি? নবী করীম (সঃ) বললেনঃ যে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করে মরেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করে মরেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।"

(সহীহ মুসলিম)

শিরককারীদের সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ বলেন, "আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন আ'মল করলো যাতে আমাকে ছাড়া আর অন্য কাউকেউ শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি না। তার সম্পর্ক তার সাথে থাকে, যাকে সে শরীক করেছে।" (সহীহ মুসলিম, সুনানে ইবনে মাযাহ)

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! পবিত্র আল কুরআনের ক্ষদ্রতম সূরাগুলোর মধ্যে সূরা ইখলাস একটি ক্ষুদ্রতম সূরা হলেও তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা ব্যাপক বিস্তর। ক্ষুদ্রজ্ঞান নিয়ে চেষ্টা করেছি তার ব্যাখ্যা করার। এখন আমরা জানবো, এই সূরা আমাদেরকে কি কি শিক্ষা দিচ্ছে। নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

১. তৎকালীন নবীর যুগে মক্কার মুশরিক, সাবেয়ী এবং অগ্নিপুজক আর মদীনার ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্যরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন, ধারণা এবং আকীদা পোষণ করতো, যুগ যুগ ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত উপরোক্ত জাতি বা গোষ্ঠীর লোকেরা তো আছেই তার সাথে যোগ হয়েছে নামধারী মুসলিমরা, যারা অহরহ আল্লাহর সাথে শিরক করে যাচ্ছে। আর আকীদাগত ভাবেও একজন মুসলিম হওয়ার পরও শিরকী আকীদা পোষণ করে যাচ্ছে যা অত্যন্ত গরহীত অমার্জনীয় অপরাধ। একজন খাঁটি তাওহীদবাদী মুমিন এ আকীদা পোষণ করবে না- করতে পারে না।।

২. তাওহীদ তথা আল্লাহর একাত্ববাদের বিষয়ে বাস্তবে তো নয়, বরং আকীদাগত ভাবেও এ ধরনের ধারণা বা বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহর একাত্ববাদের বিপরীত তখনই হবে, যখন আল্লাহর জাত ও শিফাতের সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা হবে। যেমন, আল্লাহর জাতের

www.pathagar.com

সাথে কতিপয় অবুঝ বিদআ'তী নামধারী আলিমরাও বলে থাকেন, "আল্লাহর নূরে নবী পয়দা তার নূরে সবই পয়দা" (নাউযুবিল্লাহ)। এছাড়া কেউ কেউ তো কোনো কোনো পীর, ওলী-আউলিয়াকে আল্লাহ কেন, আল্লাহর উপরেও পৌছিয়ে দেয় (নাউযুবিল্লাহ)।

যেন রাখুন, যার যা মর্যাদা আছে তাকে সেখানেই মর্যাদা দিতে হবে। যেমন, আল্লাহকে আল্লাহর স্থানে রাখতে হবে। তার স্থানে অন্য কাকেউ কেন, কোনো কিছুকেই স্থান দেয়া যাবে না। নবী-রাসূলগণকে নবী-রাসূলদের মর্যাদায় রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। সাহাবাগণকে সাহাবাদের স্থানেই রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। তাবেয়ী'নদেরকে তাঁদের স্থানেই রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। তাবা তাবেয়ী'নদেরকে তাঁদের স্থানেই রাখতে হবে, অন্য কাকেউ তাঁদের স্থানে স্থান দেয়া যাবে না। পীর বলে তো ইসলামে কোনো পদ-পদবী নেই। আর ওলী আউলিয়া কে, তাতো আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন-ই বেশী ভালো জানেন। যে কোনো মুমিন-মুসলিমই আল্লাহর ওলী হতে পারেন,তাঁর জ্ঞান, তাকওয়া ও আ'মল বা কর্মদ্বারা।

৩. এ আকীদা বা ধারণা রাখতে হবে যে, কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল নন। তিনি যেমন বিশ্ব জাহান সৃষ্টির ক্ষেত্রে কারো মুখপেক্ষী বা সহযোগিতা নেননি, তেমনি তাঁর এই বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্যও কারো সহযোগিতা কামনা করেন না এবং কারো মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল নন। এমনকি কারো ইবাদত পাওয়ার জন্যও মুখাপেক্ষী নন। কেননা, সারা দুনিয়ার মানুষও যদি তাঁর ইবাদত-বন্দেগী না করে, তাতে তার একবিন্দুও ক্ষতি হবে না। আবার সারা দুনিয়ার মানুষও যদি দিন-রাত ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, তাতেও তাঁর একবিন্দু উপকার হবে না। লাভ-ক্ষতি মানুষের-ই। যদি মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে তবে বান্দাহর-ই লাভ। আর যদি দাসত্ব বা ইবাদত বন্দেগী না করে তবে বান্দাহর-ই ক্ষতি।

৪. আল্লাহর কোনো বংশ-জাত নেই। অর্থাৎ আল্লাহকে যেমন কেউ জন্ম দেননি-তেমনি আল্লাহও কাউকে জন্ম দেননি, এই আকিদা পোষণ করতে হবে। ইহুদীরা যেমন ওজায়ের (আঃ) কে আল্লাহর সন্তান দাবী করে

দ্বিত্ববাদে বিশ্বাস করে শিরক করে, তেমনি খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর সন্তান এবং মরিউম (আঃ) কে আল্লাহর স্ত্রী দাবী করে তৃত্ববাদে বিশ্বাস করে শিরক করে। আর মুশরিকরা অসংখ্য ছোট-বড় দেব-দেবীর পূজা করে বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে শিরক করে। একজন তাওহীদ বাদী বা পন্থী এর কোনোটাতেই বিশ্বাস তো দূরে থাক, ধারণাও পোষণ করতে পারে না।

৫. আল্লাহর সাথে কাকেউ সমকক্ষ মনে করা বা তুলনা করা যাবে না। আল্লাহকে আল্লাহর স্থানেই স্থান দিতে হবে। তাহলে একজন মুসলিম হয়েও কিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে ? পীর পূজা করে? কবর পূজা করে? চাকুরী পাবার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান ও স্বনির্ভর হওয়ার জন্য, সন্তান লাভের জন্য পীরবাবার দরবারে ছাগল, মুরগী, টাকা-পয়সা নিয়ে ছুটে যায়? কিভাবে একজন মৃতব্যক্তির কবরের পাশে বসে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে থাকে, আর পীর বাবার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে ? কিভাবে একজন মুসলমান আল্লাহ ছাড়া মানুষের সামনে মাথানতো করে, এমনকি পায়ের সামনে সাজদায় পড়ে যেতে পারে? ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভুনীতে বা দিনের শুরুতেই বাকী দিলে সারাদিনে বাকী দিতে হবে মনে করতে পারে ? বিবাহ-সাদীর ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো কিভাবে আচার অনুষ্ঠান করে শিরক করে থাকে ? আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক মনে করতে পারে ? অথচ আমরা কালিমায় ঘোষণা দেই যে, لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মা'বুদ নেই, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক নেই'।

৬. একজন তাওহীদবাদী আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকেউ আইন দাতা, রিযিক দাতা, পালনকর্তা মনে করতে পারে না এবং আকীদাও পোষণ করতে পারেনা। অথচ আমাদের দেশের মতো অসংখ্য সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম দেশও কুরআনের স্পষ্ট বিধি-বিধান, আইন-কানুন থাকার পরেও এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) ১০টি বছর আল্লাহর আইন দ্বারা রাষ্ট্র এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার বাস্তব আদর্শ থাকার পরও আমরা মানব রচিত আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করে যাচ্ছি। এমন কি মানুষের তৈরী করা আইন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান এবং

www.pathagar.com

নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছে বা আন্দোলন সংগ্রাম করছে, তাদেরকে বাধা সৃষ্টি করছি। নবীর যুগের কাফির-মুশরিকদের মতো জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছি। এমনকি সমাজ থেকে তাদেরকে উৎক্ষাত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করছি। তাহলে কি আমরা ইহুদী, নাসারা ,কাফির ও মুশরীকদের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি না ? একজন তাওহীদবাদী মুসলমান কোনো ভাবেই আল্লাহর বিধি-বিধান এবং শাসন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো বিধি-বিধান এবং শাসন ব্যবস্থা বিশ্বাস এবং গ্রহণ করতে পারে না। যারা এরূপ করে, মহান আল্লাহ সূরা মায়িদায় তাদেরকে কাফির, ফাসিক এবং যালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হে আল্লাহ আমাদেরকে কাফির, মুশরিক, ফাসিক এবং যালিম হিসেবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে একজন পরিপূর্ণ খাঁটি তাওহীদবাদী মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করো। আমীন।

আহবানঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা ইখলাসের যে ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করা হলো, তাতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যাই তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা আল্লাহর একাত্ববাদ সম্পর্কে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

www.pathagar.com

দুই

দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফর থেকে বাধা দানের নির্দেশ

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির-৭৪

আয়াত ১ -৭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) ওহে কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী। (২) উঠুন, অতঃপর (জাতিকে) সাবধান-সতর্ক করুন। (৩) আর আপনার রব এর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। (৪) আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন (৫) এবং (সকল প্রকার) অপবিত্রতা হতে দূরে থাকুন। (৬) বেশী প্রতিদান পাবার আশায় অন্যকে দান করবেন না। (৭) আর আপনার রব এর উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করুন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ يَا - হে/ওহে। اَلْمُدَّثِّرُ - চাদরাবৃত/ কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী। قُمْ - দাঁড়ান/উঠুন। فَاَنْذِرْ - অতঃপর সতর্ক করুন/সাবধান করুন। وَ - এবং/আর। رَبَّكَ - তোমার/আপনার প্রতিপালকের। فَكَبِّرْ - অতঃপর বড়ত্ব/মহত্ব ঘোষণা করুন। ثِيَابَكَ - আপনার পোষাক। فَطَهِّرْ - অতঃপর পবিত্র করুন/পবিত্র রাখুন। اَلرُّجْزَ - অপবিত্রতা/ মলিনতা।

www.pathagar.com

فَاهْجُرْ - অতএব দূরে থাকুন। وَلَاتَمْنُنْ - এবং দান/অনুগ্রহ করবেন না। تَسْتَكْثِرُ - অধিক/বেশী পাবার আশায়। لِرَبِّكَ - আপনার পালনকর্তার জন্যে /উদ্দেশ্যে। فَاصْبِرْ - অতএব ধৈর্য ধারণ করুন।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামুআলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল কুরআনের একেবারেই প্রথম পর্যায়ে নাযিলকৃত 'সূরা মুদ্দাস্‌সির' এর প্রথম সাতটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'অমা তাওফীকী ইল্লাবিল্লাহ'।

সূরাটির নামকরণ ঃ এই সূরাটিও অন্যান্য সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত اَلْمُدَّثِّرُ শব্দটিকেই নামকরণ হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে, কোনো বিষয়বস্তুর শিরোনাম হিসেবে নয়। اَلْمُدَّثِّرُ শব্দটি دِثَارٌ (দাসার) থেকে উদ্ভুত। অর্থ শীত বা ঠান্ডা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোষাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত কাপড়। যাকে আমরা এক কথায় লেপ বা কম্বল বলে থাকি।

সূরাটি নাযিলের কারণ ও সময়কাল ঃ সূরাটি দু'টি অংশে অবতীর্ণ হয়। প্রথম অংশ ১ম থেকে ৭ম আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়। আল কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা আ'লাকের ১ম পাঁচটি আয়াত নাযিলের পর নবী করীম (সঃ) কে রাসূলের দায়িত্ব দিয়ে কতিপয় নির্দেশ সম্বলিত মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয় যখন নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন কাফিরদের মধ্যে এই আশংকা সৃষ্টি হলো যে, যদি তাঁর এ দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে যায় তাহলে তো আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হবে। তাই তাঁর এই দাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য তৎকালীন কাফিরদের মধ্যে কোটিপতি অলীদ ইবনে মুগীরার নেতৃত্বে কুরাইশদের সভা করে (আল্লাহর বাণী কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে সত্য জানার পরেও)

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা কুরআনকে যাদু ও মুহাম্মদ (সঃ) কে যাদুকর বলে প্রচার করে বিরোধিতা শুরু করে। তাদের এই বিরোধিতা এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে সূরার দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয়।

সূরার ১ম সাতটি আয়াত মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদ-ই আহমদ প্রভৃতি কিতাবে হযরত জাবির ইবনে অব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। তাতে এতদূর বলা হয়েছে যে, ইহা রাসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কুরআন মজিদের প্রাথমিক আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মাহর নিকট একথা সর্বসম্মত ও সর্বসমর্থিত মত যে, নবী করীম (সঃ) এর প্রতি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়া আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ হতে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। তবে সহীহ বর্ণনা সূত্রে পাওয়া যায় যে, এই প্রথম ওহীর পর কিছুকাল ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকার পর পুনরায় ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হলে সূরা اَلْمُدَّثِّرْ এর প্রথম এই সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম জহুরী (রহঃ) এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বর্ণনা করেন যে, প্রথম ওহী নাযিলের পর একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) এর উপর ওহী নাযিল বন্ধ থাকে। ওহী বন্ধ থাকার ফলে তাঁর মনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তিনি দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন, ফলে তিনি কখনও কখনও পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিজেকে নিচে ফেলে দিতেও উদ্ধত হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি যখনই কোনো পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেন, তখনই হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলতেন, 'আপনি তো আল্লাহর নবী।' একথা শুনে তাঁর অস্থির মনে অনেকটা শান্তনা ফিরে পেতো এবং মনের অস্থিরতা ও উদ্বেগে জর্জরিত অবস্থার লাঘব হতো।
(ইবনে জরীর)

'ফাতরাতুল ওহী' বা 'ওহী বন্ধ থাকা' এই সময়ের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ একবার আমি পথ চলছিলাম। এমন সময় আমি উপর থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। উপরের দিকে তাকালেই দেখতে পেলাম , সেই ফিরিশতা যিনি হেরা গুহায় হাজির

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসনে বসে আছেন। এ দেখে আমি ভয়ানক ভীত ও সংকিত হয়ে বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বললামঃ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও','আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো'। বাড়ীর লোকেরা এটা শুনে আমাকে কম্বল বা লেপ দিয়ে জড়িয়ে দিলো। এই সময় আল্লাহ তা'লা ওহী নাযিল করলেন- يَاَيُّهَاالْمُدَّثِّرْ - অতঃপর অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল হতে থাকলো। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমদ, ইবনে জরীর)

সূরার অবশিষ্ট অংশ অষ্টম আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় তখন, যখন প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে যাবার পর মক্কায় প্রথম বারের মতো হজ্জ্ব পালন করার সুযোগ আসে। (সিরাতে ইবনে হিসামে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে)

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ সর্বপ্রথম ওহী সূরা আ'লাকের ১ম পাঁচটি আয়াতে জ্ঞান অর্জন ও তার গুরুত্ব এবং মানুষের সৃষ্টিত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) কে কোন্ মহান কাজের দায়িত্বশীল বানানো হচ্ছে এবং তাঁর দায়িত্ব বা কি তার কিছুই এখানে বলা হয়নি। কেবলমাত্র একটা প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরে কিছু দিনের জন্য ওহীর বিরতি দেয়া হয়, যেন এই প্রথম ওহী নাযিলের অভিজ্ঞতায় তাঁর মন-মগয ও প্রকৃতির উপর যে কঠিন চাপ পড়েছে- এই সময়ের মধ্যে তা দূর হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে ওহী গ্রহণের ও নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানুষিক ও শারিরীকভাবে প্রস্তুত হতে পারেন। এই মানষিক ও শারিরীক প্রস্তুতিকালটি অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার যখন ওহী নাযিলের ধারা শুরু হলো, তখন এই সূরায় প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল করে প্রথমবারের মতো তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলোঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! উঠুন, এখন কম্বল দিয়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আপনি আপনার নবুওয়াতের দাযিত্ব পালন করুন, মানুষকে সতর্ক করুন, নিজের মন-মগজ, পোষাক-আষাক ও দেহকে পবিত্র করুন, পংকিলময় গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পংকিলতা থেকে মুক্ত করুন। মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করুন। আর এই সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বিনিময়

www.pathagar.com

আশা করবেন না। সবকিছু আল্লাহর ওয়াস্তে করুন এবং আপনি আল্লাহর জন্যই ধৈর্যধারণ করুন।

সূরার দ্বিতীয় অংশে নবীজীর প্রকাশ্যে দাওয়াতে কাফিররা যে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো, বিশেষ করে হজ্জের মওসুমে নবীজী যদি হজ্জের কাফিলার সাথে স্বাক্ষাৎ করেন এবং হাজীদের সমাবেশে কুরআনের এই অতুলনীয় ও মর্মস্পর্শী কালাম পাঠ করে শুনাতে থাকেন, তাহলেতো গোটা আরবের প্রত্যান্তঞ্চলে তাঁর দাওয়াত পৌঁছে যাবে। আর তার ফলে কতো মানুষ যে প্রভাবিত হয়ে পড়বে তার ইয়ত্তা থাকবে না। এই কারণে কুরাইশ সরদাররা একটি সম্মেলনের আয়োজন করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, হাজীদের মক্কায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডা শুরু করে দিতে হবে। এ কথায় সবাই একমত পোষণ করলে তৎকালীন কোটিপতি কুরাইশ সর্দার অলীদ ইবনে মুগীরা বললো, মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বললে তো লোকেরা আমাদের কারো প্রতি আস্থা রাখতে পারবে না, কাজেই তাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে একটি বক্তব্যই ঠিক করে নিতে হবে-যাতে করে সবাই একই কথা বলে। তখন কেউ কেউ বললো, মুহাম্মদকে গণক, কেউ কেউ বললো, জ্বিনগ্রস্থ, কেউ কেউ বললো, পাগল, কেউ কেউ বললো, কবি, আবার কেউ কেউ বললো, যাদুকর বলা হোক। কুরাইশ সরদার অলীদ বললো, এসবের মধ্যে হতে যা কিছুই তোমরা তাঁর সম্পর্কে বলো না কেন, লোকেরা এসবকে একটি অবাঞ্ছিত অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেবে। অলীদ আল্লাহর নামে শপথ করে বললো, কুরআনের এই বাণী অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ। এর শিকড় অতী গভীরে। উহার শাখা-প্রশাখাও প্রচুর ফলদায়ক। অলীদের এ কথায় আবু জেহেল সংশয় প্রকাশ করে বললো, অলীদ, তুমি যদি তোমার নিজের বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় না বলো, তাহলে জাতির লোকেরা তোমার প্রতি আস্থাশীল হতে পারবে না। তখন সে চিন্তা-ভাবনা করে বললো, তোমরা সবাই আরবদের নিকট বলবে, মুহাম্মদ একজন যাদুকর। তিনি এমন বাণী পেশ করেন, যা লোকদেরকে তার বাপ,ভাই,স্ত্রী,সন্তান ও গোটা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অলীদের এ কথাটি উপস্থিত সবাই গ্রহণ করলো। পরবর্তীতে হজ্জের মওসুমে পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরাইশ বংশের প্রতিনিধিরা হাজীদের সামনে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই কথা ছড়াতে লাগলো

এবং মুহাম্মদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দিলো। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো যে, তাদের এই প্রচারণায় মুহাম্মদ (সঃ) এই সংবাদ গোটা আরব জাহানে ছড়িয়ে বিস্তার করে দিলো। (সীরাতে ইবনে হিসাম-১ম খন্ড) আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ৮ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত এই ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৮ থেকে ১০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে সত্যদ্বীন অমান্যকারীদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ তারা যা কিছু করছে এর মারাত্মক পরিণতি কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই দেখে নেবে।

১১ থেকে ২৬ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে অলীদ ইবনে মুগীরার নাম না নিয়েই বলা হয়েছে যে, লোকটিকে আল্লাহ তা'লা অফুরন্ত নিয়া'মাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সে তার বিনিময়ে নির্লজ্জভাবে সত্য দ্বীনের বিরোধীতায় মেতে উঠেছে। সে একদিকে মুহাম্মদ (সঃ) ও আল কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসী ছিলো। কিন্তু অন্যদিকে সে নিজ জাতির মধ্যে প্রাধান্য এবং নেতৃত্বকে বিপন্ন করে দিতে প্রস্তুত ছিলো না। ফলে সে ঈমানতো আনলো-ই না, বরং আল কুরআনকে যাদু এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে মানুষকে তাঁর থেকে দূরে রাখার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা চালাতে থাকলো। লোকটির এই জঘণ্য মানসিকতার বিভৎস রূপকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ও তাঁর নবীর সাথে এসব হীন কার্যকলাপের পরও সে নির্লজ্জভাবে দাবী করতো যে, তাকে আরো নিয়া'মাত দেয়া হোক। অথচ তার এই কার্যকলাপের জন্য কোনো পুরস্কার তো দূরে থাক, দোযখের কঠিন শাস্তি তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

২৭ থেকে ৪৮ নম্বর আয়াতসমূহে দোযখের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন্ সব চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকেরা এই দোযখের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৯ থেকে ৫৩ নম্বর আয়াতসমূহে কাফিরদের রোগের আসল কারণ ও মূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো, পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক-বেপরোয়া। দুনিয়ার এই জীবনকেই তারা সবকিছু বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এটাকেই তারা সর্বশেষ মনে করে। এই কারণেই তারা আল কুরআন হতে অনেক দূরে সরে যায়।

www.pathagar.com

সূরার সর্বশেষ অংশে অর্থাৎ ৫৪ থেকে ৫৬ নম্বর আয়াতসমূহে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো কারো ঈমানের কাঙ্গল নন। কেউ ঈমান আনুক আর না আনুক তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। কুরআন কোনো ব্যক্তির নয় বরং সকলের জন্যই নসীহতের কিতাব। তা সকলের সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছে। এখন যার ইচ্ছা সে ঈমান আনবে। আর যার ইচ্ছা হবে না সে ঈমান আনবে না। তবে নাফরমানী করার ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করা উচিত। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন-পূর্বে সে যতোবার-ই অপরাধ করে থাকুক না কেন।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত এক থেকে সাত নম্বর আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু হলো, প্রথম ওহী নাযিলের পর দীর্ঘ সময় বিরতির কারণে নবী করীম (সঃ) এর মনে যে দিধা ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিলো, পরক্ষণে পুনরায় পথ চলতে গিয়ে বিশালকায় জীবরাঈল (আঃ) কে দেখে যে ভীতি সৃষ্টি হয়ে জ্বরে বা ঠান্ডায় মানুষ যে ভাবে কাঁপে সেভাবে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে গিয়ে কম্বল বা লেপ গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। সে অবস্থায় রিসালাতের দ্বায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে ডেকে বলা হচ্ছে, এভাবে কম্বল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকলে চলবে না। হে নবী! উঠুন, আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করুন, এ বলে তাঁকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সাতটি কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, যা পরবর্তীতে ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর কতিপয় অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো, যা দারস বুঝার জন্য বেশ সহায়ক হবে। এখন আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। তার পূর্বে জেনে নেয়া প্রয়োজন কোন্ প্রেক্ষাপটে বা কারণে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

শানে নুযুল বা নাযিলের কারণ ঃ তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর উল্লেখিত আয়াতসমূহ নাযিলের প্রেক্ষাপট বা কারণ হিসেবে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে যে, "ফাত্‌রাতুল ওহী" অর্থাৎ অহী বন্ধ হয়ে যাবার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (সঃ) বলেন, একদিন আমি পথে চলছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক হতে

www.pathagar.com

আমার কানে একটা শব্দ পৌঁছলো! চোখ তুলে দেখলাম যে, হেরা পর্বতের গুহায় যে ফিরিশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসির উপর বসে রয়েছেন। ভয়ে আমি মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং বাড়ী এসেই বলি যে ' زَمِّلُوْنِىْ ' ' زَمِّلُوْنِىْ ' 'আমাকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দাও' 'আমাকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দাও'। আমার কথামতো বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিলো। তখন يَٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَاَنْذِرْ হতে فَاهْجُرْ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়"। তারপর ক্রমান্বয়ে ওহী নাযিল হতে থাকে। (ইবনে কাসীর)

অন্য এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরায়িশদের যিয়াফত দেয়। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করে; আচ্ছা, তোমরা কি এই লোকটি (মুহাম্মদ) সম্পর্কে বলতে পারো ? কেউ কেউ বললো যে, তিনি যাদুকর। অন্য কেউ বললো যে, না, তিনি যাদুকর নন। কেউ কেউ তাঁকে গণক বললো। আবার অন্য কেউ বললো যে, না তিনি গণকও নন। কেউ কেউ তাঁকে কবি বলে মন্তব্য করলো, কিন্তু অন্য কেউ বললো যে, না, তিনি কবিও নন। তাদের কেউ কেউ এই মন্তব্য করলো, তিনি এমন যাদুকর- যে যাদু তিনি লোক পরস্পরায় লাভ করেছেন। পরিশেষে তারা সবাই একথাই একমত হলো যে, তাঁকে যাদুকরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ খবর পেয়ে খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন এবং তিনি কাপড় দিয়ে মাথাসহ গোটা শরীরকে বস্ত্রাবৃত করে শুয়ে পড়লেন, ঐ সময় يَٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ হতে فَاهْجُرْ পর্যন্ত নাযিল হয়।

(ইবনে কাসীর। ইমাম তিবরাণীও এরূপ বর্ণনা করেছেন)

প্রথম ওহী --اِقْرَا দ্বারা মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আর এই ওহী- يَا يُّهَا الْمُدَّثِّرْ দ্বারা তাঁকে রাসূল বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

يَا يُّهَا الْمُدَّثِّرْ-এই সূরার দারসের পটভূমিকায় এবং ব্যাখ্যার শুরুতে এই আয়াত কয়টির পটভূমির যে বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি, সেই সম্পর্কে

চিন্তা গবেষণা করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, এখানে মুহাম্মদ (সঃ) কে يَاأَيُّهَاالرَّسُوْلُ বা يَاأَيُّهَاالنَّبِىُّ বলে সম্বোধন করা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে يَاأَيُّهَاالْمُدَّثِّرْ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু নবী করীম (সঃ) পথ চলার সময় জিবরাঈল (আঃ) কে আসমান ও যমীনের মাঝখানে আসনে বসে থাকতে দেখে ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন অথবা অন্য বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশরা তাঁর সম্পর্কে সম্মিলিতভাবে 'যাদুকর' মন্তব্য করায় যারপর নাই দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কম্বল বা লেপ দিয়ে মুখসহ গোটা দেহ আবৃত্ত করে শুয়ে পড়েছিলেন। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁকে অন্য নামে সম্বোধন না করে يَاأَيُّهَاالْمُدَّثِّرْ বলে সম্বোধন করেছেন, এটা একটা সুক্ষ্ম সম্বোধন পদ্ধতি। এটা হতে বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ যেন বলছেন ঃ হে আমার প্রিয় বান্দাহ! আপনি কম্বল জড়ে শুয়ে পড়লেন কেমন করে ? আপনার উপর তো এক মহা কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তা পালনের জন্য মন ভাঙ্গা হলেও চলবে না কিম্বা ভয়ে ভীত হলেও চলবে না। বরং তা পালনের জন্য আপনাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে এবং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

সূরার প্রথমেই يَاأَيُّهَاالْمُدَّثِّرْ বলে সম্বোধন করে মুহাম্মদ (সঃ) কে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব হিসেবে প্রাথমিকভাবে কতিপয় ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

প্রথম নির্দেশ ঃ قُمْ فَأَنْذِرْ -উঠুন, আর (জাতিকে) সতর্ক করুন।

قُمْ এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে না থেকে দাঁড়িয়ে যান। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থও নেয়া যেতে পারে। উদ্দেশ্য হলো, এখন আপনি হিম্মত করে জনগণকে পরিশুদ্ধি বা সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

فَأَنْذِرْ শব্দটি اِنْذَارٌ শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ 'সতর্ক করা'। আর এই সতর্ক হলো স্নেহ ও ভালোবাসার সতর্ক। যেমন, পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিচ্ছু থেকে সতর্ক করে, পথ চলতে গিয়ে গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে।

www.pathagar.com

রাসূলগণকে نَذِيْرٌ (সতর্ককারী) ও بَشِيْرٌ (সুসংবাদ দানকারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) এর ন্যায়ও হযরত নূহ (আঃ) কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেয়া কালেও ঠিক এই ধরনেরই একটি নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছিলো ঃ اَنْذِ رْقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"(হে নবী!) কঠিন পীড়াদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তুমি তোমার জাতির লোকদেরকে ভয় দেখাও, সতর্ক-সাবধান করো।" (সূরা নূহ-১)

এই দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতটির তাৎপর্য হলো, হে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তি! উঠুন, আর আপনার চারপাশের অবহেলায়-উপেক্ষায় পড়ে থাকা লোকদেরকে সতর্ক করুন, সাবধান করুন। তারা বর্তমানে যে অবস্থায় পড়ে আছে, তারা যদি এ অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটায় তাহলে তাদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। হে নবী (সঃ)! তাদেরকে সাবধান করে দিন যে, তারা এমন কোনো মগের মুল্লুকে বাস করছে না যে, এখানে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে! তারা যেনো এমন কিছু মনে না করে যে, তাদের দুনিয়ার এই কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে না এবং তাদেরকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে না!

দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বের ঘোষণা করুন।

এখানে رَبٌّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সকল প্রকার বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনার যোগ্য বা অধিকারী। تَكْبِرْ শব্দটি আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে- اَللهُ اَكْبَرْ ।

একজন নবীর প্রাথমিক কাজ-ই হলো, আল্লাহর তাকবীর বা বড়ত্ব ঘোষণা করা। দুনিয়ায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধাণ্য প্রতিষ্ঠিত করাই হলো নবী-রাসূলদের কাজ। সুতরাং হে নবী! আপনার প্রথম পর্যায়ের কাজ-ই হলো, অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এখানে যার যার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধাণ্য মেনে চলছে, তাদের সকলের-ই মূলোৎপাটন করা এবং দরাজ কণ্ঠে গোটা দুনিয়ায় ঘোষণা

করে দেয়া যে, এই বিশ্বলোকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধাণ্য নেই। আর এই কারণেই ইসলামে اَللهُ اَكْبَرْ বাক্য ও ধ্বনিটি খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই اَللهُ اَكْبَرْ এর ধ্বনি কানে পৌছিয়ে দেয়া হয়। দিনে পাঁচবার আজানের শুরুতেই اَللهُ اَكْبَرْ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সালাতের শুরুতেও اَللهُ اَكْبَرْ ধ্বনি দিয়েই সালাত আরম্ভ করা হয়। জবেহ্ করার সময় জন্তুকে হালাল করার জন্য بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرْ বলেই জবেহ করতে হয়। সাহাবাগণও কোনো উচ্চ ধ্বনি দিলে اَللهُ اَكْبَرْ বলেই ধ্বনি দিতেন। এমনকি আবহমান কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিমরা কোনো শ্লোগান দিলে اَللهُ اَكْبَرْ বলেই শ্লোগান দেয়। এটা মুসলমানদের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ও সাতন্ত্র বিধানকারী নিদর্শন।

আল্লাহর নবীকে তাঁর রবের বড়ত্ব ও মহাত্ম ঘোষণার নির্দেশের পেছনে আরও একটি তাত্বিক দিক হলো, আলোচ্য সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার কারণ থেকেই জানা যায় যে, তৎকালীন মক্কা ছিলো শিরক এর লিলা কেন্দ্র। সেখানকার লোকজন সাধারণ আরবদের ন্যায় কেবল মুশরীক-ই ছিলো না, বরং এই এলাকার লোকেরা ছিলো এর চেয়েও অনেক বেশী অগ্রসর। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, মক্কা শরীফ ছিলো গোটা আরবের মুশরীকদের কেন্দ্রীয় তীর্থভূমি। আর কুরাইশ বংশের লোকেরাই ছিলো এর-ই সেবায়েত বা খাদেম। এরূপ যায়গায় কোনো একজন ব্যক্তির একাকী এই প্রতিষ্ঠিত শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা ছিলো বড়ই কঠিন ও প্রাণ হরণকারী কাজ। এই কারণেই সূরার শুরুতেই 'উঠুন' এবং 'সাবধান করুন' বলার পর পরই বলা হয়েছে, 'আপনার রবের প্রাধাণ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে দিন'। এরূপ বলা হতেই বুঝতে পারা যায় যে, এসবের একবিন্দু পরওয়া না করতে বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হে নবী! ঘোষণা করে দিন যে, আমার আল্লাহ সেইসব হতেও বড় ও শ্রেষ্ঠ, যারা আমার এই দ্বীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহর কাজ আরম্ভ করার

পূর্বে কোনো ব্যক্তির সাহস-হিম্মত বৃদ্ধি করার জন্য এছাড়া আর বড় কথা কোনো কিছুই হতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে যার মন-মগজে আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দৃঢ় মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই একাকী গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে ও সকল বিরোধী শক্তির সাথে লড়াই শুরু করতে একবিন্দু দ্বিধাসংকোচ বা ভয়-শঙ্কা অনুভব করতে পারে না।

তৃতীয় নির্দেশ ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - **আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন।**

ثِيَابٌ শব্দটি ثَوْبٌ এর বহুবচন। একে لِبَاسٌ ও বলা হয়। এর আসল অর্থ কাপড়। এর অনেকগুলো রূপক অর্থ রয়েছে। যেমন, কর্ম বা কাজকে ثَوْبٌ বা لِبَاسٌ বলা হয়। আবার অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও ثَوْبٌ বা لِبَاسٌ বলা হয়। আবার মানব দেহকেও لِبَاسٌ বলা হয়। যার প্রমাণ আল কুরআনে ও আরবী বাক-পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণ উপরোক্ত সকল অর্থই গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, হে নবী! আপনি স্বীয় পোষাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং অসৎচরিত্রতা থেকে মুক্ত রাখুন। (মাযহারী)

মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তার তাফসীরে ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর তাৎপর্য ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন-

প্রথম তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার পোষাক ও দেহকে মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র রাখুন। কেননা, দেহ ও পোষাকের পবিত্রতা ও মন মানসিকতা এবং আত্মার পবিত্রতা পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। রাসূলে করীম (সঃ) যে সমাজ বা জনপদে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করেছেন, সেই সমাজ বা জনপদ কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়েই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলো না। বরং তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার সাধারণ ও প্রাথমিক জ্ঞান বা

www.pathagar.com

ধারণাটুকুও ছিলো না। এমতাবস্থায় রাসূলে করীম (সঃ) এর কাজ ছিলো এই লোকদেরকে সবদিক দিয়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেয়া। এ কারণেই তাঁকে এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে নবী! আপনি আপনার বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একটা উচ্চতর মান রক্ষা করে চলুন। বস্তুত এই নির্দেশের কারণেই নবী করীম (সঃ) মানব জাতিকে দেহ ও পোষাকের পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার খুটি-নাটি বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। যা হাদীসের কিতাবসমূহের প্রথমেই "কিতাবুত তাহ্রাত" বা "পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার অধ্যায়" দিয়ে শুরু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার পোষাক পরিচ্ছদ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। অতীত কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুনিয়াত্যাগী বগ ধার্মিকদের অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকাকেই ধর্মপালনের একটি মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর তা হলো, যতো বেশী অপরিষ্কার ও গন্ধযুক্ত পোষাক জড়িয়ে থাকা যায়, ধর্মীয় পবিত্রতা ততো বেশী অর্জন করা যায় এবং যে লোক যতো বেশী অপরিচ্ছন্ন সে ততো বেশী ধার্মীক ও আল্লাহর প্রিয় ওলী বা দরবেশ। আর যদি কেউ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে, তাহলে তাকে দুনিয়াদার বলে অভিহিত ও দোষারোপ করা হয়।

অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হলো ময়লা-অপরিচ্ছন্নতাকে ঘৃণা করা। আর ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সাধারণ অনুভূতিই যার মধ্যে আছে সে ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন মানুষের সাথেই ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে। এ কারণেই আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবানকারী দায়ী'দের প্রতি যরুরী করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের বাহ্যিক অবস্থা যেন এতোটুকু সুষ্ঠ, সুন্দর ও নির্মল পরিচ্ছন্ন হয় যার ফলে লোকেরা তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো মলিনতা যেন তাদের ব্যক্তিত্বে এক বিন্দু পরিমাণ স্থান না পায়।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার পোষাককে নৈতিক দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। আপনার পোষাক তো অবশ্যই স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হবে। কিন্তু তাতে যেন অহংকার, গৌরব, দেখানোপনা, রিয়াকারিতা, জাঁক-জমক ও শান-শওকতের চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে। পোষাক-ই যেন আপনার পরিচয় না তুলে ধরে। বরং নীতি-নৈতিকতায় যেন আপনার পরিচয় হয়। কেননা, যেসব জিনিস ব্যক্তিকে জনগণের

www.pathagar.com

সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেয় তার মধ্যে পোষাক-ই হলো প্রথম জিনিস। সে কি ধরনের পোষাক পরেছে, তা দেখেই অনুমান করা যায় যে, সে কি রকমের লোক। লোকটি আসলে কি রকম- তা তার পোষাকেই জনগণকে প্রথমেই জানিয়ে দেয়। যেমন, রাজা-বাদশাহ, সমাজ প্রধান, রাষ্ট্র প্রধান, নবাব-সুবেদারদের পোষাক। অহংকারী দাম্ভিক ও বড় লোকদের পোষাক। হীন ও নীচ চরিত্রের লোকদের পোষাক। ধর্মব্যবসায়ীদের পোষাক। গণক, ঠাকুর ও ভবোঘুরাদের পোষাক আপন আপন ব্যক্তিত্বের ও স্বভাব-প্রকৃতির পরিচিতি দান করে। এদের মধ্যে আল্লাহর দিকে আহবানকারী দায়ী'দের মেযাজ-প্রকৃতি স্বভাব এসব লোক থেকে স্বভাবতই ভিন্ন হয়ে থাকে। এসব কারণেই তাদের পোষাক-আশাক এইসব লোক থেকে ভিন্ন ধরনের হবে। তাদের পোষাক এমনই হবে, যা দেখেই মানুষ অনুভব করবে যে, এরা খুবই ভদ্র লোক। তাদের মনমানসিকতায় কোনো প্রকার খারাবী স্থান পায়নি।

চতুর্থ তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি আপনার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখুন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইব্রাহীম নখয়ী, শা'বী, আতা, মুজাহীদ, কাতাদাহ, সায়ী'দ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী ও অন্যান্য বড় বড় মুফাস্‌সীর এই আয়াতের তাৎপর্যে বলেছেন, আপনার চরিত্র পবিত্র ও নিস্কলুষ রাখুন ও সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে নিজেকে মুক্ত রাখুন-দূরে রাখুন। যেমন, আরবী প্রবাদে বলা হয় - فُلَانٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ "অমুক ব্যক্তির কাপড় পরিচ্ছন্ন" বা فُلَانٌ طَاهِرُ الذَّيْلُ "অমুক ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী"। এধরনের কথা থেকে নৈতিক পরিচ্ছন্নতা বুঝানো হয়ে থাকে।

এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক প্রবাদ হলো فُلَانٌ دَنِسُ الثِّيَابِ "অমুক ব্যক্তির কাপড় অপরিচ্ছন্ন"। আর এর তাৎপর্য হয়, লোকটি বড়ই খরাপ কাজ করে বা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক। তার কথা বিশ্বাস করা যায় না।

(তাফহীমুল কুরআন)

পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতাকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন-

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ - "পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধাংশ"।

তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর ও পোষাককে বাহ্যিক নাপাকি থেকে এবং মন ও অন্তরকে আভ্যন্তরীন অশুচি থেকে পবিত্র রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ ঃ وَالرُّجْزَفَـــاهْجُرْ **আর (সকল প্রকার) অপবিত্রতা-মালিনতা হতে দূরে থাকুন।"**

رُجْـــزَ শব্দটির অর্থ ব্যাপক অর্থবোধক। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেন, অপবিত্রতা-মলিনতা-পুতিগন্ধময়তা বলতে সকল প্রকার খারাপ জিনিস বুঝানো হয়েছে। আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র ও কর্ম কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ, থাকা, খাওয়া, চলা-ফিরা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্র ও সকল পর্যায়ের অপবিত্রতা ও পুতিগন্ধময়তা এর অন্তরভুক্ত।

মূল কথা হলো, হে নবী! আপনার চারপাশের অর্থাৎ গোটা সমাজেই যে চরম পর্যায়ের অপবিত্রতা ও পুতিগন্ধময়তা বিদ্যমান রয়েছে, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রাখুন। কেউই যেন বলতে না পারে যে, আপনি সমাজের মানুষকে যেসব খারাপ কাজ-কর্ম অপবিত্রতা হতে দূরে থাকতে বলছেন, তা কোনো একটির সামান্য পরিমান নামগন্ধও আপনার জীবনে বিদ্যমান রয়েছে।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, যুহরী ও ইবনে যায়েদ প্রমুখ এখানে رُجْـــزَ এর অর্থ নিয়েছেন 'প্রতিমা' বা 'মূর্তি'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর এক অর্থ নিয়েছেন 'গোনাহ্'। অতএব আয়াতের অর্থ হলো এই যে, হে নবী! আপনি প্রতিমা পূজা ও গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। এ বিষয়ে কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো আগে থেকেই প্রতিমা পূজা ও

গোনাহ্ থেকে মুক্ত ছিলেন, তার ধারে-কাছেও ছিলেন না। তাহলে তাঁকে এই আদেশ দেয়ার অর্থ কি ? তাঁকে এই নির্দেশ দেয়ার অর্থ হলো, হে নবী! আপনিতো এসব থেকে মুক্ত আছেন-ই, ভবিষ্যতেও একাজ থেকে দূরে থাকুন।

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নবীর উপর নির্দেশের অর্থ হলো, তাঁর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে শিক্ষা দেয়া। তাই উম্মতে মুহাম্মদীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বেশী গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে রাসূলকেই সম্বোধন করে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে। যাতে উম্মতে মুহাম্মদী বুঝতে পারে যে, কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিষ্পাপ নবীকেও এ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ - আর বেশী পাবার আশায় অন্যকে দান করবেন না।

এই নির্দেশটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপক। একটি মাত্র বাক্য দ্বারা এর সমস্ত তাৎপর্য ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই-জন্য এর অর্থের কয়েকটি তাৎপর্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি যার প্রতি অনুগ্রহ করবেন বা যাকে দান করবেন কিম্বা যার প্রতি ভাল ব্যবহার করবেন, তা করবেন নিঃস্বার্থভাবে। আপনার দান, বদান্যতা, সৌজন্যতা, দানশীলতা ও উত্তম আচার-আচরণ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। মনের মধ্যে কোনো প্রকার দুনিয়ার স্বার্থ বা সুযোগ সুবিধা লাভ করার একবিন্দু আশাও পোষণ করবেন না।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! নবুয়াতের দায়িত্ব পালনে আপনি যে কাজ-ই করছেন, নিঃসন্দেহে এটা একটা নিজস্বভাবে মহান কাজ। কেননা, আপনার কারণে ও আপনার মাধ্যমেই বিশ্ব মানব হিদায়েত লাভ করেছে। কিন্তু সেই জন্য আপনি মানুষের প্রতি কোনো প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ করছেন তা কখনও ধারণা করবেন না বা মনে প্রশ্রয় দেবেন না। আর তার জন্য নিজে কোনো সুযোগ সুবিধা বা স্বার্থ লাভের চেষ্টাও করবেন না।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ হে নবী! আপনি যদিও একটি অনেক বড় কাজ ও মহান কাজ সুসম্পন্ন করছেন, কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে কখনও খুব

www.pathagar.com

বড় ও বিরাট কাজ মনে স্থান দেবেন না। মনে করবেন না যে, আপনি বিরাট কিছু করে ফেলেছেন। আর নবুওয়াতের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে এবং এই কাজে যার পরনাই কষ্ট স্বীকার করে আপনি আপনার আল্লাহর প্রতি মস্ত বড় একটা অনুগ্রহ করছেন এমন কথা বা কল্পনা কস্মিণ কালেও মনে স্থান দিবেন না। এই আয়াত হতে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে তা পরবর্তীতে শিক্ষণীয় বিষয়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠ নির্দেশ ঃ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ **- আর আপনার রব এর জন্য ধৈর্যধারণ করুন।**

এখানে صَبْرٌ (সবর)শব্দটির অর্থও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)। রিসালাতের মহান যে দায়িত্ব আপনার উপর সঁপিয়া দেয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, দুর্বিসহ এবং কষ্টদায়ক কাজ। এই কাজে বহু রকম ও ধরনের কঠিন বিপদ-মসীবত, বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এ কাজের কারণে নিজের জাতির লোকেরাই আপনার শত্রু হয়ে যাবে। গোটা আরব মল্লুক আপনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু হে নবী, এ পথে যা কিছুরই আপনাকে সম্মুখীন হতে হোক না কেন তা আল্লাহর জন্য হাঁসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। বিচলিত হলে চলবে না। তাতে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং পূর্ণমাত্রায় দৃঢ়তা ও স্থিতিশিলতার সাথে তা বরদাস্ত করে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে যেতে হবে।

হে নবী! আপনাকে এ কাজ হতে নিরব রাখার জন্য ভয়, লোভ-লালসা, বন্ধুতা, শত্রুতা, ভলোবাসা ইত্যাদি অনেক কিছুই আপনার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এসব কিছুর মুকাবিলায় আপনাকে নিজের নীতি, আদর্শ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর অটল-অবিচলভাবে ধৈর্যের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। (তাফহীমূল কুরআন)

প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আল্লাহ তা'লা তাঁর রাসূল (সঃ) কে এসব আদেশ-নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হয়েছিলো যে, কম্বল বা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে না থেকে হে নবী, আপনি উঠুন এবং উঠে

www.pathagar.com

নবুয়তের দায়িত্ব পালনের কাজ শুরু করে দিন। এসব ছোট ছোট বাক্য এবং এর অর্থ ও তাৎপর্য কেউ যদি চিন্তা-বিবেচনা করে দেখে, তাহলে তার মন অবশ্যই সাক্ষ্য দিবে যে, একজন নবীকে তাঁর নবুয়তের কাজ আরম্ভ করার সময় এর চেয়ে উত্তম কোনো হিদায়াত দেয়া যেতে পারে না। বস্তুত তাঁকে কার্যত কি কি কাজ করতে হবে, এখানে সেসব বিষয় স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর প্রথম ৭টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য পেশ করা হলো। এখন এখান থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১. আল্লাহর দ্বীনী দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি কিম্বা মনের কষ্টের কারণে ঘরে শুয়ে-বসে থাকা যাবে না।

২.মানুষকে কঠিন ও ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচার জন্য দরদী মন নিয়ে, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে সতর্ক-সাবধান করে যেতে হবে, এতে মানুষ ভুল বুঝে যতই বিরোধীতা করুক না কেন, অথবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ কিম্বা কটুক্তি করুক না কেন।

৩. যদি কারো বড়ত্ব, মহত্ব কিম্বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে হয়, তাহলে গোটা বিশ্ব জাহানের রব বা প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার-ই করতে হবে। তাকবীর ধ্বনী দিতে হলে আল্লাহরই তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে। শ্লোগান দিতে হলে আল্লাহর নামেই শ্লোগান দিতে হবে। কেননা, দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বড়ত্ব ও মহত্ব পাওয়ার বা ঘোষণা দেয়ার যোগ্য নয়।

৪. একদিকে যেমন বাহ্যিকভাবে নিজের দেহ ও পোষাক পরিচ্ছদকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে হবে। তেমনি দেহ-মন ও অন্তরকেও সকল প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস-চিন্তা ও পংকিলতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আবার গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেও পবিত্রতা, পংকিলতা ও কুসংস্কার থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

৫. যারা বকধার্মিক-তারা শরীর ও পোষাক-আশাককে অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন ও এলোমেলো থাকাকেই ধার্মিকতা ও আল্লাহ্ প্রেমীক দরবেশী কাজ মনে করে থাকে। তাদের এ অলীক কল্পণা ও বকধার্মিকতা থেকে দূরে থাকতে হবে। অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্নতা, ময়লা দুর্গন্ধময়তাকে আল্লাহ যেমন পছন্দ করেন না তেমনি ফিরিশতারাও তার ধারে কাছেও যায় না। আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতামন্ডলী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّـوَّ بِـيْنَ وَيُحِـبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে পছন্দ করেন।" হাদীসে ঈমানের অর্ধেক বলে নবী করীম (সঃ) বলেন اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ "পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেকাংশ।"

৬. পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আরো একটি শিক্ষা হলো, পোষাক-পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকতে হবে। পোষাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তবে তা যেন গর্ব-অহংকার ও রিয়াকারে পরিণত না হয়ে যায়। নিজের পোষাক-ই যেন পরিচয় তুলে না ধরে। বরং নীতি-নৈতিকতায় যেন ব্যক্তির পরিচিতি হয়। এ দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

৭. নিজের চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুস রাখতে হবে। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে নিজের চরিত্রকে মুক্ত রাখতে হবে-দূরে রাখতে হবে।

৮. অপবিত্রতা, মলিনতা পুতিগন্ধময়তা থেকে দূরে থাকতে হবে। একদিকে যেমন নিজের আকিদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ, নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রকে সকল প্রকার অপবিত্রতা, পংকিলতা ও পুতি গন্ধময়তা থেকে দূরে থাকতে হবে, তেমনি পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফিরা ও কাজ-কামকে অপবিত্রতা ও পংকিলতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। শিরকের মতো মহা গোনাহ যেমন, প্রতিমা বা মূর্তিপূজা, কবর পূজা, পীর পূজা, খানকা-দরগাহ পূজা সহ বিভিন্ন প্রকার পূজা থেকে দূরে থাকতে হবে। তাছাড়া সকল প্রকার গোনাহর কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৯. বেশী পাবার আশায় অন্যকে দান করা যাবে না। বিনিময় পাবার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কারো কোনো উপকার করলে তার বিনিময়ের আশা করা যাবে না। হাদীয়া বা উপঢৌকন বিনিময় পাবার আশায় দেয়া যাবে না। এমনকি আল্লাহর কোনো বন্দেগী বা নেক কাজ করে কিম্বা দ্বীনের কাজ করে মনে করা যাবে না যে, আল্লাহর মহা উপকার করলাম। কেননা, কোনো নেক কাজ কিম্বা দীনের কাজ করে আল্লাহর কোনো উপকার হয় না, যদি উপকার বা কল্যাণ হয় তা নিজেরই উপকার বা কল্যাণ হয় মনে করতে হবে।

১০. আল্লাহর দ্বীনের এসব কাজ বা আ'মল করতে যেয়ে অধৈর্য হলে চলবে না। বরং আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে যেয়ে একদিকে যেমন ভয়-ভীতি, জুলুম-নির্যাতন, বাধা-বিপত্তি, ক্ষয় ক্ষতিকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে আল্লাহর দ্বীনের কাজ থেকে দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার লোভনীয় অফার, লোভ-লালসা, সম্মান-খাতিরকেও মহা পরীক্ষা মনে করে ধৈর্যের সাথে সবকিছুকে উপেক্ষা করে দ্বীনী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহর দ্বীনে টিকে থাকার জন্য সদাসর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

আহ্বান ঃ প্রীয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা মুদ্দাস্‌সির এর ১ম সাতটি আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে বা অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় কিম্বা কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আপনাদের সামনে যেসব শিক্ষা তুলে ধরা হলো তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা সবাই আ'মল করতে পারি, মহান আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

www.pathagar.com

তিন

কথায় কাজে গরমিল বর্জন

সূরা আস্ সফ- ৬১
আয়াত নং-১-৪

نَحمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج وَهُوَالعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۝
كَبُرَمَقْتًاعِنْدَاللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহিমা যোষণা করছে। তিনিই পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। (২) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন সেই কথা বলো যা তোমরা কাজে করো না। (৩) এটা আল্লাহর কাছে খুবই ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা করো না। (৪) আল্লাহ তো সেই সব লোকদেরকে ভালোবাসেন, যারা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধভাবে তাঁর পথে লড়াই করে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ سَبَّحَ - তাসবীহ/পবিত্রতা/মহিমা বর্ণনা করে। لِلّٰهِ, - আল্লাহর জন্যে। مَـــا - যা কিছু। فِــىْ - মধ্যে। اَلسَّــمٰوٰتِ - আসমানসমূহের/ আকাশমন্ডলীর। اَلاَرْضِ - পৃথিবীর। وَهُوَ -

এবং তিনিই। اَلْعَزِيْزُ - পরাক্রমশালী। اَلْحَكِيْمُ- প্রজ্ঞাময়/মহাবিজ্ঞানী। يٰـا - ওহে/হে। اَلَّـذِيْـنَ -যারা। اٰمَنُـوْا - ঈমান এনেছো। لِـمَ - কেন। تَقُوْلُوْنَ - তোমরা বলো। مَا - যা। لَاتَفْعَلُـوْنَ - তোমরা করো না। كَبُرَمَقْتًا -অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়/অতিশয় ক্রোধ জনক। عِنْـدَاللهِ - আল্লাহর নিকট বা কাছে। اَنْ تَقُوْلُوْا - তোমরা বলো এমন কথা যে। مَا لَاتَفْعَلُوْنَ -যা তোমরা করো না। اِنَّ اللهَ - নিশ্চয় আল্লাহ। يُحِبُّ - মহব্বত করেন/ পছন্দ করেণ। اَلَّـذِيْنَ - যারা। يُقَـاتِلُوْنَ - লড়াই করে। فِـىْ سَبِيْلِهٖ - তাঁর পথে। صَـفًّا-দলবদ্ধভাবে/ সারিবদ্ধভাবে। كَاَنَّهُمْ - যেন তারা। بُنْيَانٌ - প্রাচীর। مَرْصُوْصٌ - সীসা ঢালা/সুদৃঢ়।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা! আসসালামুআলাইকুম অয়ারহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সূরা আস্ সফ এর প্রথম চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াকৃত আয়াত কয়টির দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৪নং আয়াত يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَـبِيْلِهٖ صَـفًّا এ উল্লেখিত صَفٌّ শব্দটিকেই বেছে নিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। صَفٌّ শব্দের অর্থ হলো, দলবদ্ধ বা সারিবদ্ধ। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার মধ্যে صَفٌّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র আল কুরআনের ১১৪টি সূরার অধিকাংশ সূরার নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। অনুরূপ সূরা সফ এর নামকরণও প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে, কোনো শিরোনাম হিসেবে নয়। তবে তা করা হয়েছে ওহীর নির্দেশ ক্রমেই।

www.pathagar.com

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। তবে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরাটি নাযিলের সময়কাল জানা যায়নি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবত সূরাটি ওহুদ যুদ্ধের কাছাকাছি সময় নাযিল হতে পারে। কেননা, এতে যে অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে তা এই সময়টিই বিরাজ করছিলো।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ঃ সংক্ষেপে সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো, কথা ও কাজে গরমিল বর্জন। ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠা ও আন্ত রিকতা সৃষ্টি এবং আল্লাহর পথে জান-মাল উৎসর্গ করার জন্য মুমিনদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং জান-মাল উৎসর্গকারীদের মর্যাদা ও পুরস্কারের কথাও বলা হয়েছে।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ সূরা আস্ সফ এর ১ থেকে ৪নং আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হলো- সৃষ্টির সবকিছুই আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। মুমিনদেরকে মুনাফিকী বর্জনের তাগাদা। আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় কোন্‌টি এবং তাঁর প্রিয়ভাজন কারা সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটির শানে নুযুল ঃ তিরমিজী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা কিছু সাহাবী (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করছিলেন যে, আল্লাহ তা'লার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আ'মল কোন্‌টি যদি আমরা তা জানতে পারতাম, তাহলে আমরা তাই করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেন যে, কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আ'মলটি কি জানতে পারলে আমরা তার জন্যে জান-মাল সবকিছুই কোরবান করে দিতাম।

(তাফসীরে মাযহারী)

ইবনে কাসীর মুসনাদ-ই আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পর এই আলোচনা করার পর একজনকে রাসূল (সঃ) এর নিকট এ বিষয়ে জানার জন্যে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু কারও তাঁর কাছে যাবার হিম্মত হলো না। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের প্রত্যেককে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (এতে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।) তাঁরা সবাই এক এক করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর

www.pathagar.com

দরবারে হাজির হলে তিনি তাঁদেরকে "সূরা আস্ সফ" পুরোটাই শুনিয়ে দিলেন- যা তখনই তাঁদের কথার পরিপেক্ষিতে নাযিল হয়েছিলো।

এ সূরা থেকে জানা যায়, যেসব সাহাবী সবচেয়ে প্রিয় আ'মল বা কাজটির তালাশ করছিলেন সেটি হলো, জান-মাল দিয়ে প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ বা আন্দোলন-সংগ্রাম করা। তবে আল্লাহ্ তা'লা এই সূরাতেই তাঁদের এ ধরনের আগে বেড়ে আ'মল তালাশের বিষয়টি সমালোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারসের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। সূরার প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেন-

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। তিনি পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ এর سَــبَّحَ শব্দটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- পবিত্রতা বা মহিমা। ব্যাপক অর্থে বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিস-ই চিরকাল ঘোষণা করে আসছে যে, উহার সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'লা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি হতে মুক্ত ও পবিত্র। অসম্পূর্ণতা, দূর্বলতা ও খারাবী হতে পূত-পবিত্র। তাঁর সত্তা পাক ও পবিত্র। তাঁর গুণাবলী পরিচ্ছন্ন ও কলংকমুক্ত। তাঁর কাজ-কর্মসমূহ সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর আইন-কানুন, হুকুম আহকামও (তা প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি পর্যায়ের হোক কিংবা শরীয়তের পর্যায়ে হোক) সবই পুত-পবিত্র। এ সবই হলো سَبَّحَ শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য। এ শব্দটি অতীত কালও বুঝায়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালও বুঝায়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিশ্বজাহানের প্রতিটি বিন্দু ও অনুপরমানু উহার মহান সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী রব এর পবিত্রতা, মাহাত্ম্য ও মহিমা বর্ণনা ও প্রকাশ করে আসছে,

www.pathagar.com

আজও করছে, ভবিষ্যতেও সদাসর্বদা করতে থাকবে। তবে সৃষ্টির সেরা মানুষ এর ব্যতিক্রম।

সমস্তপ্রাণী ও গাছপালা আল্লাহ তা'লার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে। সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মাঝে অবস্থানকারী সমস্ত সৃষ্টিজীব ও প্রত্যেকটা জিনিসই তাঁর পবিত্রতা, প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মশগুল রয়েছে, কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে পারে না।

যেমন, সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

"সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যারা রয়েছে, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। আর এতে এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু (হে মানুষ) তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ন।"

আল্লাহ তা'লার বড়ত্ব ও মাহত্বের বর্ণনা হলো, সবাই তাঁর সামনে নীচু, অক্ষম ও শক্তিহীন। তাঁর নির্ধারিত শরীয়ত এবং হুকুম-আহকাম, হিকমত ও কৌশলে পরিপূর্ণ। প্রকৃত বাদশাহীতো তাঁরই যাঁর কতৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন রয়েছে। সমস্ত মাখলুকের ব্যবস্থাপক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে। তিনিই সৃষ্টি করেন আবার তিনিই ধ্বংস করেন। তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন, দিয়ে থাকেন। তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না বা হতে পারে না।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -এই বাক্যটিতে هُوَ শব্দটি সর্বনাম যা সর্বপ্রথম বসানো হয়েছে, এতেই নিরংকুশতার তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ কথা শুধু এতটুকু-ই নয় যে, তিনি পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। বরং প্রকৃত কথা হলো, একমাত্র আল্লাহ-ই এমন এক সত্তা যিনি পরাক্রমশালীও আবার মহাবিজ্ঞানীও।

www.pathagar.com

عَزِيْزٌ –শব্দের অর্থ হলো, পরাক্রমশালী, মহাশক্তিমান ও অশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যাঁর সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করতে কেউই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না, তা প্রতিরোধ করা কারোরই সাধ্য নেই। যাঁর আনুগত্য প্রত্যেককেই করতে হয়। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক প্রত্যেককেই তাঁর নির্দেশ ও আইন মেনে নিতে হয়। যাঁর নাফরমানী করে কেউ তাঁর পাকড়াও হতে রক্ষা পেতে পারে না-রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ও নেই।

حَكِيْمٌ – শব্দের অর্থ হলো, মহা কৌশলী ও মহাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন বিশেষ বুঝ-সমঝ, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথেই করেন। কোনো একটি কাজও অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর সাথে তিনি করেন না। এসব দূর্বলতার লেসমাত্র থাকে না।

সূরার শুরুতে এই আয়াত বা বাক্যটি পরবর্তী আয়াতগুলোতে যে বক্তব্য বা ভাষণ পেশ করা হয়েছে তার ভূমিকা স্বরূপ। এরূপ ভূমিকা দিয়ে মূল বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এ কারণে যে, পরে যেসব বক্তব্য পেশ করা হবে তা শোনার পূর্বে প্রত্যেকেই যেন একথা খুব ভালোভাবে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লার কর্তৃত্বে কারো ঈমান আনা এবং কারোও সাহায্য ও ত্যাগ-কুরবানী স্বীকারের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং এসব থেকে তিনি বহু উর্দ্ধে।

বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'লার পবিত্রতা, বড়ত্ব ও বিজ্ঞতার ঘোষণা দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন সেই কথা বলো, যা তোমরা কাজে করো না। এটা আল্লাহর জন্য খুবই ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।

শানে নুযূল ঃ বিভিন্ন তাফসীরকারগণ এই আয়াতসমূহের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত ইবনে

www.pathagar.com

আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে মুমিনদের মধ্য হতে কিছু লোক বলতো, হায়! আমরা যদি সেই আ'মল বা কাজটি জানতে পারতাম যা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, তা হলে আমরা তাই করতাম। কিন্তু যখন বলে দেয়া হলো যে, সেই আ'মল বা কাজটি হলো জিহাদ, তখন তাদের সেই বলা কথা পূর্ণ করাই তাদের জন্য কষ্ট হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'লা আয়াত নাযিল করেন- لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ
"তোমরা সেই কথা কেন বলো, যা তোমরা কাজে করো না।"

কোনো কোনো গুরুজন বলেন যে, এটা ঐ লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা বলতোঃ 'আমরা যুদ্ধ করেছি' অথচ তারা যুদ্ধ করেনি। বলতোঃ 'আমরা আহত হয়েছি', অথচ তারা আহত হয়নি। বলতোঃ 'আমরা প্রহৃত হয়েছি' অথচ প্রহৃত হয়নি। বলতো ঃ 'আমরা ধৈর্যধারণ করেছি' অথচ ধৈর্যধারণ করেনি। তারা বলতো ঃ 'আমাদেরকে বন্দী করা হয়েছে' অথচ তাদেরকে বন্দী করা হয়নি। (ইবনে কাসীর)

আয়াতটির প্রথম বক্তব্য হলো এই যে, সাচ্চা-খাঁটি নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা ও কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য অবশ্যই থাকতে হবে। যে যা মুখে বলবে তাকে তা কাজে দেখাতে হবে। আর করার ইচ্ছা বা সাহস-হিম্মত না থাকলে মুখেও তা উচ্চারণ করা যাবে না। আসলে বলা যতো সহজ করা ততো কঠিন। মুখে বলা আর বাস্তবে করা এক নয়। মুখে বলে কাজে না করা এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের স্বভাব। আল্লাহ তা'লার নিকট এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং ক্ষোভের বিষয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীদার ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বদ অভ্যাস বা স্বভাব কখনই শোভা পায় না। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেমন মুমিনের বৈশিষ্ট্য তেমনি তা ভঙ্গ করা হলো মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর নবী (সঃ) মুনাফিকদের লক্ষণ বা নিদর্শন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَا فِقِ ثَلاَ ثَةٌ - اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ
وَ اِذَا اُئتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি ঃ (মুসলিম শরীফে অতিরিক্ত বর্ণনা, যদিও সে সালাত, সওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে, তবুও সে

মুনাফিক) (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে ওয়াদা করে বা প্রতিশ্রুতি দেয় তা পূরণ করে না (৩) এবং কোনো কিছু তার কাছে আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অপর একটি হাদীসে আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا - اِذَا أُتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে পূর্ণ মুনাফিক। আর যার মধ্যে উহার যে কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব অবশ্যই পাওয়া যাবে- যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে। সেই চারটি স্বভাব হলো- (১) যখন সে আমানতের খিয়ানত করবে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে, (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে, আর (৪) যখন ঝগড়া-ফাসাদ করে তখন সে অশ্লীল ও অনৈতিক কথা ও কাজ করে।"

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রকৃতপক্ষে কোনো লোক যদি আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা করে কিম্বা মানত মানে অথবা মানুষের সাথে কোনো চুক্তি বা সন্ধি করে কিম্বা কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় অথবা কিছু করার বা দেয়ার ওয়াদা করে, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব বা অবশ্যই করণীয়। কিন্তু কেউ যদি কোনো গোনাহর কাজে ওয়াদা করে বা প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে সেই কাজটি তো করা যাবেই না, বরং তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ওয়াদা বা কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

(সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতে এই কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে)

উপরোক্ত সহীহ হাদীস দু'টিতে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে মুনাফিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের ভয়াবহ ও কঠিন পরিণতির কথা সূরা আন্ নিসায় উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

www.pathagar.com

"নিশ্চয় মুনাফিকদের (পরকালে) অবস্থান হবে জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থানে এবং তোমরা তাদের জন্যে কখনও কোনো-সাহায্যকারী পাবে না।"

(আয়াত নং -১৪৫)

আয়াতের ব্যাখ্যায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, যেসব লোক ইসলামের জন্য জান-প্রাণ ও চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের লম্বা লম্বা ও বড় বড় ওয়াদা করে, কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষার সময় পিছুটান দেয়, বিভিন্ন প্রকার বাহানা তালাশ করে, তাদেরকে তিরস্কার করাই হলো এই কথার উদ্দেশ্য। এরা আসলে দূর্বল ঈমানের লোক। তাদের এই দূর্বলতাকে কুরআনের কয়েকটি স্থানেই শক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা নিসা-য় বলা হয়েছে-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ج وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ج لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ط

"(হে নবী!) আপনি কি সেই লোকদের দেখেছেন, যাদেরকে বলা হয়েছিলো তোমাদের হাতগুলোকে সংযত রাখো, সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও? এখন যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এখন তাদের মধ্যে একদল লোকের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমনই ভয় করে যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহকে বরং তার চেয়েও বেশী ভয় করে। আর তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ার দেগার! কেন আমাদের প্রতি এই যুদ্ধ লিখে (ফরজ করে) দিলে? আমাদেরকে কেন আরো একটু সময়-সুযোগ দিলে না?" (আয়াত নং-৭৭)

অনুরূপ সূরা মুহাম্মদ-এ বলা হয়েছে-

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ج فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ لا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ

www.pathagar.com

"যারা ঈমান এনেছে তারা বলতেছিলো, এমন সূরা কেন নাযিল করা হয় না (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হবে)। কিন্তু যখন একটি সুদৃঢ় সূরা নাযিল করা হলো-যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিলো, তখন (হে নবী) আপনি দেখতে পেলেন যে, যাদের অন্তরে রোগ ছিলো তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন তাদের উপর মৃত্যু আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।" (আয়াত নং-২০)

বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের সময় লোকদের এই দূর্বলতা স্পষ্ট ও প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিলো। যা সূরা আলে ঈমরানের ১৩তম রুকু থেকে ১৭তম রুকু পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব দূর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন- মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রহঃ) বলেন, ওহুদ যুদ্ধে এসব লোক পরীক্ষার সম্মুখীন হলে, তারা নবী করীম (সঃ) কে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলো। কাতাদাহ ও দহ্হাক (রহঃ) বলেন, কোনো কোনো লোক যুদ্ধে অংশ নিতো বটে কিন্তু তারা কোনো কাজ করতো না। কিন্তু ফিরে এসে হামবড়ামী করে বলতো, আমরা এভাবে এভাবে লড়াই করেছি, এভাবে, এভাবে মেরেছি। এ ধরনের লোকদেরকেই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'লা বিশেষ ভাবে তিরস্কার করেছেন। অবশ্য আল্লাহর কাছে প্রিয় আ'মল তালাশকারীদের মধ্যে মজবুত ঈমানের অধিকারী লোকও ছিলো। এ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, "যারা এসব কথা বলছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আনসারীও (রাঃ) ছিলেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং জানা গেল যে জিহাদ হলো সবচেয়ে উত্তম আ'মল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিজেকে ওয়াক্ফ করে দিলেন। তার উপরই তিনি কায়েম থাকেন এবং আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান।" (ইবনে কাসীর)

অতঃপর আল্লাহ তা'লার প্রিয়ভাজন লোক কারা তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

নিশ্চয় আল্লাহ্ সেইসব লোকদেরকে মহব্বত করেন বা ভালোবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধভাবে তাঁর পথে লড়াই-সংগ্রাম করে।

www.pathagar.com

ইতোপূর্বেকার আয়াতে মহান আল্লাহ দুর্বল ঈমানের বা মুনাফিকদের তিরস্কার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এখন যারা প্রকৃত এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী তাদের জন্য এক প্রকার সুসংবাদ যে, তিনি ঐসব মজবুত মুমিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন যারা শত্রুর বিরুদ্ধে ইস্পাত প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে দৃঢ়-মজবুতভাবে জিহাদ করে, আন্দোলন-সংগ্রাম করে, যাতে আল্লাহর কালিমা বুলোন্দ হয়, ইসলামের হিফাজত হয় এবং তাঁর দ্বীন সমস্ত মতোবাদের উপর বিজয়ী হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোককে দেখে আল্লাহ তা'লা হেঁসে থাকেন। ১. যারা রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। ২. সালাতের জন্য যারা কাতারবন্দী হয় এবং ৩. যুদ্ধের জন্য যারা সারিবদ্ধ হয়। (ইবনে কাসীর)

উল্লেখিত আয়াতে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। প্রথমতঃ জানা গেল যে, আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয় সেইসব ঈমানদার লোকের, যারা তাঁর পথে জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করতে এবং বিপদ-ঝঞ্জা মাথায় নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত ঃ জানা গেল যে,যারা আল্লাহর সন্তোষে ধন্য হয়ে সংগ্রাম করতে চায়, তাদের মধ্যে তিনটি গুণ থাকতে হবে।

১. তারা তীব্র চেতনা ও গভীর উপলব্ধির সাথে আল্লাহর পথে লড়াই-সংগ্রাম করবে। এমন পথে লড়াই-সংগ্রাম করবে না, যা 'ফী-সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে পড়ে না।

২. তারা উচ্ছৃংখল হবে না, সংগঠন বিরোধী ও অনিয়মতান্ত্রিক কাজে জড়িয়ে পড়বে না। তারা সুসৃংখল, সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই-সংগ্রাম করবে।

৩. দুষমন ও শত্রুদের মোকাবেলায় ইস্পাত-কঠিন প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হবে। এই শেষ কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, যুদ্ধের ময়দানে বা আন্দোলন-সংগ্রামে দূর্ভেদ্য প্রচীরের ন্যায় ইস্পাত-কঠিন ভাবে দাঁড়াতে পারে কেবলমাত্র সেই বাহিনীটি যাদের মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে। যেমন-

www.pathagar.com

ক. তাদের নৈতিক চরিত্র হবে অতি উন্নতমানের। যদি সেই বাহিনী কিংবা দলের সেনাপতি বা সিপাহী কিম্বা নেতা-কর্মীদের সেই বন্ধন এবং মান হতে নিম্নের হয়, তাহলে পারস্পরিক ভালোবাসা-হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হতে পারে না, কেউ কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না। ফলে ঐ গুণের অভাবে পারস্পারিক কোন্দল ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে যা কেউ তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

খ. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে থাকতে হবে আন্তরিকতা, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও অনঢ়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় সংকল্প ও আন্তরিকতায় গোটা বাহিনীকে আত্মদান ও জীবন উৎসর্গ করতে আবেগে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আর এর ফলেই তারা যুদ্ধের ময়দানে ইস্পাত কঠিন ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় অবিচল-অটল ও মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

এসবের ভিত্তিতেই নবী করীম (সঃ) এর মহান নেতৃত্বে এমন এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী বা সংগঠন গড়ে উঠেছিলো যার সাথে সংঘর্ষে এসে তৎকালীন বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলোরও পতন ঘটেছিলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো শক্তিই তার সামনে দাঁড়িয়ে টিকে থাকতে পারেনি। (তাফহীমুল কুরআন)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আজকে যুগেও যতই আধুনিক প্রযুক্তি ও পরমানুর যুগ বলিনা কেন, যদি উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি সুসৃংখল, নিয়মতান্ত্রিকতা সম্পন্ন মজবুত ঈমানের অধিকারী আদর্শ চরিত্রবান দল বা সংগঠন পরিচালিত হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবেই। আর এরাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে মহব্বতের এবং প্রিয়ভাজন লোক। মহান আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে 'সূরা আস্ সফ' এর প্রথম চারটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো। এখন আমরা আলোচনা করবো এতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে। নিম্নে শিক্ষাণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. আসমান এবং যমীনের (মানুষ বাদে) সব কিছুই আল্লাহর পবিত্রতা, মহত্ব ও বড়ত্ব সার্বক্ষণিকভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছে। অতএব প্রতিটি

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ বান্দাহর উচিত হবে আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা এবং একমাত্র তাঁরই সামনে সাজদাহ্‌বনত হওয়া।

২. যদি কোনো মানুষ আল্লাহর পবিত্রতা মহত্ব এবং বড়ত্ব ঘোষণা না করে, তাহলে দুর্দান্ত প্রতাপশালী, মহাক্ষমতাধর, মহাবিজ্ঞানী ও মহাকৌশলী আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউ-ই রেহাই পাবে না। একদিন না একদিন তাঁর কোপানলে পড়তেই হবে। বাঁচার কোনো-ই উপায় থাকবে না।

৩. আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের জন্য কোনো কাঠিন্য বা পরীক্ষা কামনা করা উচিত নয়।

৪. প্রতিটি মুমিনেরই উচিত হলো, যা সে কথা দিবে বা ওয়াদা করবে কিম্বা কসম করবে অথবা সন্ধি করবে তা যথাযথভাবে পালন করা। তা আল্লাহর সাথেই হোক বা মানুষের সাথেই হোক কিম্বা পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন হোক। তা বাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হোক অথবা দেশে দেশে যুদ্ধের ক্ষেত্রেই হোক সকল পর্যায়েই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি কিম্বাচুক্তি পালন করা, যদি তা অন্যায় বা পাপ কাজের জন্য না হয়। আর যদি কেউ কোনো গোনাহ্ বা অন্যায়ের কাজের কসম করে কিংম্বা প্রতিশ্রুতি তা হলে তা তো ভঙ্গ করবেই। কিন্তু ওয়াদা বা কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেমন মুমিনের লক্ষণ, তেমনি তা ভঙ্গ বা খেলাপ করাও হলো মুনাফিকির লক্ষণ। একজন মুমিন মুনাফিকী থেকে বাঁচার জন্য যখন তখন যারতার সাথে যে-সে কাজে ওয়াদা করা থেকে বিরত থাকবে। যদি কেউ কারো সাথে কোনো বিষয়ে ওয়াদা করে, তা অবশ্যই পালন করবে। আর কোনো মুমিন তো কোনো অন্যায় বা পাপের কাজে ওয়াদা করতেই পারে না।

৬. কোনো বান্দাহ্ মুখে যা বলবে তা কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। যদি কেউ তা না করে তাহলে সে আল্লাহর রোসানলে পড়বে। কেননা, কথা দিয়ে কাজে পরিণত না করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়। তার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ।

৭. আল্লাহর প্রিয়ভাজন এবং ভালোবাসার পাত্র হতে হলে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তারই পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ লড়াই সংগ্রাম করতে হবে।

www.pathagar.com

৮. যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে তাদের নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে এতো উন্নতমানের হতে হবে যে, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ইস্পাত কঠিন হবে। আর তাদের এই ভ্রাতৃত্বই হবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দাহ তারাই হবে যারা আল্লাহর মহব্বতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অটুট হয়ে ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের ন্যায় মজবুত ভাবে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে লড়াই-সংগ্রাম করবে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে সূরা আস্ সফ এর প্রথম চারটি আয়াতের যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা এই সূরা থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি, সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়াআখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

চার

হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ তা'লা। কর্মীদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং ত্রুটি মাফ করা। পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকা ও আল্লাহর উপর ভরসা করা। আল্লাহর সাহায্য থাকলে কোনো শক্তিই বিজয়ী হতে পারবে না।

সূরা আলে ঈমরান- ৩

আয়াত- ১৫৬-১৬০

اَلْحَمدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلاَ مٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعدُ فَاَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَّوْكَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَاقُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌمِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْقُتِلْتُمْ لَاِلَى اللهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُم

www.pathagar.com

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَ
كَّلْ عَلَى اللهِ ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○ اِنْ يَّنْصُرْكُمُ
اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ م بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১৫৬) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কাফিরদের মতো কথা বলো না। তাদের ভাই-বন্ধুরা পৃথিবীতে কোনো অভিযানে বের হলে কিংবা যুদ্ধে অংশ নিলে (আর সেখানে কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে তারা মারাও যেতো না এবং নিহতও হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ্ তাদের মনের খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন। অথচ আল্লাহ্ই জীবন-মৃত্যু দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কর্মের উপর তিনি নজর রাখেন। (১৫৭) যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মারা যাও তাহলে তোমরা আল্লাহ্র যে রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে, তা এরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার চেয়ে উত্তম। (১৫৮) আর তোমরা মারা যাও কিংবা নিহত হও, সকল অবস্থায় তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকেই একত্রিত করা হবে। (১৫৯) (হে মুহাম্মদ) এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, আপনি তাদের (অর্থাৎ সঙ্গীদের) প্রতি ব্যবহারে বড়ই রহম দেলের। যদি আপনি কর্কষভাষী ও কঠোর দেলের হতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব আপনি তাদের ত্রুটি মাফ করে দিন ও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (১৬০) যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউই বিজয় হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে এমন আছে তোমাদেরকে সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَا - হে/ওহে। اَلَّذِيْنَ - যারা। لَاتَكُوْنُوْا - তোমরা হয়ো না/বলো না। كَالَّذِيْنَ - তাদের মতো যারা। وَقَالُوْا - এবং তারা বলেছে। اِخْوَانِهِمْ - তাদের ভাইদেরকে। اِذَا - যখন। ضَرَبُوْا - তারা অভিযানে/সফরে বের হয়। فِى الْاَرْضِ - দেশে-বিদেশে /পৃথিবীতে। اَوْ - অথবা/কিংবা। غُزًّى - যুদ্ধে। لَوْكَانُوْا - যদি তারা থাকতো। عِنْدَنَا - আমাদের কাছে। مَامَاتُوْا - তারা মরতো না। وَمَاقُتِلُوْا - এবং তারা নিহত হতো না। لِ - যেন/জন্য। يَجْعَلَ اللهُ - আল্লাহ বানিয়ে দেন বা করে দেন। ذٰلِكَ - ঐরূপ/এরূপ। حَسْرَةً - খেদ/আক্ষেপ। فِىْ - মধ্যে। قُلُوْبِهِمْ - তাদের অন্তরগুলোর। يُحْيِ - তিনি জীবন দান করেন। وَيُمِيْتُ - এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। بِمَاتَعْمَلُوْنَ - তোমরা যা কাজ করো। بَصِيْرٌ - প্রতক্ষ করেছেন/দেখে থাকেন। وَلَئِنْ - এবং অবশ্যই যদি। قُتِلْتُمْ - তোমরা নিহত হও। فِى سَبِيْلِ اللهِ - আল্লাহর পথে। اَوْ - অথবা। مُتُّمْ - তোমরা মৃত্যু বরণ করো। لَمَغْفِرَةٌ - অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। مِنَ اللهِ -আল্লাহর পক্ষ হতে। خَيْرٌ - উত্তম। مِمَّا - যা তা হতে। يَجْمَعُوْنَ - তোমরা জমা করছো। اِلَى اللهِ - আল্লাহর দিকে। تُحْشَرُوْنَ - তোমরা একত্রিত হবে। فَبِمَارَحْمَةٍ - এটা বিশেষ বা বড়ই রহমতের। مِنَ اللهِ - আল্লাহর পক্ষ থেকে। لِنْتَ لَهُمْ - আপনি তাদের প্রতি কোমল দেলের। وَلَوْكُنْتَ - আর যদি আপনি হতেন। فَظًّا - কর্কষ ভাষী। غَلِيْظَ الْقَلْبِ - কঠোর দেলের । لَانْفَضُّوْا - অবশ্যই তারা সরে পড়তো। مِنْ حَوْلِكَ -

আপনার চারপাশ থেকে। فَاعْفُ عَنْهُمْ - অতএব আপনি তাদের ত্রুটি মাফ করুন। وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ - এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। وَشَاوِرْهُمْ - আর তাদের সাথে পরামর্শ করুন। فِي الْاَمْرِ - কাজে-কর্মের। فَاِذَا - অতঃপর যখন। عَزَمْتَ - সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ - আল্লাহর উপর ভরসা করুন। اِنَّ اللّٰهَ - নিশ্চয় আল্লাহ। يُحِبُّ - মহব্বত বা পছন্দ করেন। الْمُتَوَكِّلِيْنَ - ভরসাকারীদের। اِنْ - যদি। يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ - আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন। فَلَا غَالِبَ لَكُمْ - তবে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। وَاِنْ - এবং যদি। يَخْذُلْكُمْ - তোমাদেরকে ভুলে যান বা ত্যাগ করেন। فَمَنْ ذَا الَّذِيْ - অতঃপর এমন কে আছে? يَنْصُرُكُمْ - তোমাদেরকে সাহায্য করার মতো। مِنْ م بَعْدِهٖ - তার পরে বা এর পরে। عَلَى اللّٰهِ - আল্লাহর উপরই। يَتَوَكَّلْ - ভরসা করা। الْمُؤْمِنُوْنَ - সাচ্চা মুমিনদের।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাই ও বোনেরা/ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়ারহ্মাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের খিদমতে সূরা আলে ঈমরানের ১৫৬ হতে ১৬০ নং পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহবিল্লাহ"।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত اٰلِ عِمْرَانَ শব্দ থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। اٰلِ عِمْرَانَ অর্থ- 'ঈমরানের বংশধর', একেই প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে সূরার নামকরণ করা হয়েছে,

www.pathagar.com

কোনো শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দিশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি সর্বসম্মত মতে মাদানী। তবে একই সময় সম্পূর্ণ সূরাটি নাযিল হয়নি। মোট চারটি ভাষণে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ সূরার প্রথম থেকে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত প্রথম ভাষণটি চলেছে। এই ভাষণটি সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের কাছাকছি সময় নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। নবম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এই ভাষণটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ ঃ এই ভাষণটি সপ্তম রুকু থেকে শুরু হয়ে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভষণের (অর্থাৎ বদর যুদ্ধের কাছাকছি সময়ের) সাথে সথেই এই ভাষণটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

চতুর্থ ভাষণঃ এই ভাষণটি ত্রৈদশ রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এই ভষণটি নাযিল হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ এই সূরায় দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হলো 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী-খৃষ্টান এবং দ্বিতীয় দলটি হলো রাসূলের অনুসারী 'মুসলমান'।

সূরার প্রথমে 'আহলি কিতাব' তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জোরালো ভাষায় তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি ও চারিত্রিক দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং রাসূল (সঃ) ও আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দল অর্থাৎ রাসূল (সঃ) এর অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সত্যের পতাকা বহন এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পরবর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পাদাঙ্কানুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব

www.pathagar.com

'আহলি কিতাব' ও মুনাফিক মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে তাদেরকে সেই আচরণ শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান দলটির মধ্যে যেসব দূর্বলতা দেখা দিয়েছিলো তার পর্যালোচনা ও দূর্বলতা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের প্রেক্ষাপট বা কারণ ঃ সূরা আলে ঈমরানে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা যায় যে, মুসলিম বাহিনীর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম দিকে জয়লাভ করার পরও মুসলমানেরা সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করে। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। অনেকে আহত হন এবং স্বয়ং নবী করীমও (সঃ) আহত হন। কিন্তু এসবের পরেও আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। এ সাময়িক বিপর্যের তিনটি কারণ খুজে পাওয়া যায় ঃ

এক. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর গীরিপথ রক্ষার জন্য যেসব নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সঃ) জারি করেছিলেন, পারস্পারিক মতোভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ফলে ঐ তিরন্দাজ বাহিনীর কেউ কেউ বললো, রাসূলুল্লাহ এর নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের এখানেই অটল থাকা উচিত। কিন্তু অধিকাংশের মত ছিলো, এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহর এই নির্দেশ ছিলো সাময়িক। কাফিরদের গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করা হচ্ছে, আমরা যদি তাদের সাথে গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য অংশ গ্রহণ না করি, তাহলে হয়তো তা হতে বঞ্চিত হবো। অতএব সবার সাথে মিলিত হয়ে গাণিমাতের মাল সংগ্রহণ করা উচিত বলে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ গীরিপথ ত্যাগ করা।

দুই. মুনাফিকদের দ্বারা স্বয়ং নবী করীম (সঃ) এর নিহত হবার সংবাদ ছড়িয়ে দিলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভীতি ও হতাশা সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই মনোভাঙ্গা হয়ে পড়ে এবং কেউ কেউ নবী করীম (সঃ) কে রেখে পালাতে থাকে।

তিন. মদীনা শহরে অবস্থান করেই শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মতের বিষয়ে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো, সেটাই ছিলো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাফিরদের মোকাবিলা

www.pathagar.com

করার বিষয়ে নবী করীম (সঃ) যখন পরামর্শে বসেন তখন উপস্থিত সাহাবাদের অধিকাংশ মদীনার বাইরে গিয়ে মোকাবেলা করার পরামর্শ দেন। ফলে অধিকাংশ মতের ভিত্তিতে তিনি (সঃ) মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তাঁরা সাময়িক বিপর্যের সম্মখীন হয়েছিলেন। এই সূরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং নবী করীম (সঃ) এর শাহাদাতের খবর এবং সাময়িক পরাজয়ের কারণে তাঁদের মধ্যে যে ভীতি ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিলো এবং সাহাবাদের নিহত হবার প্রসঙ্গে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, এসব সামগ্রীক বিষয় নিয়ে এ সূরাটি নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারস অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য প্রদান করা হলো। এখন নিম্মে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করা হচ্ছে ঃ

ওহুদ যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিলো তাদের বিষয়ে কিছু মুমিনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন -

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কাফিরদের মতো কথা বলো না। তাদের ভাই-বন্ধুরা পৃথিবীতে কোনো অভিযানে বের হলে কিংবা যুদ্ধে অংশ নিলে (আর সেখানে কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো তাহলে তারা মারাও যেতো না এবং (যুদ্ধে) নিহতও হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ্ তাদের মনের খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন। অথচ আল্লাহই জীবন-মৃত্যু দান করেন এবং তোমাদের সমস্ত কর্মের উপর তিনি নজর রাখেন।

ওহুদ যুদ্ধে সাময়িকভাবে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ে অনেকে আহত ও নিহত হওয়ার ফলে এবং স্বয়ং সেনাপতি প্রাণপ্রিয় নবীর শহীদ হওয়ার

www.pathagar.com

সংবাদে অনেকের মধ্যে কিছু মানবিক দুর্বলতা ও অপ্রাসঙ্গিক উক্তি (তাঁরা সাহাবী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাঁদেরকে মাফ করে দিয়েছেন) যা এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'লা তা পর্যালোচনা করেছেন। তাদের এসব উক্তি বা ধারণা কাফিরদের উক্তি বা ধারণাতুল্য্য। যেমন কাফিররা তাদের ভাই বা বন্ধু কিম্বা আত্মীয়-স্বজন সফরে বা কোনো অভিযানে বের হয়ে দূর্ঘটনায় পড়ে আহত হলে কিম্বা যুদ্ধে যেয়ে নিহত হলে বলে থাকে, যদি তারা সফরে কিম্বা অভিযানে না যেতো তাহলে তারা দূর্ঘটনায় পড়ে আহত হতো না কিম্বা যুদ্ধে যদি না যেতো তাহলে তারা প্রতিপক্ষের আঘাতে নিহত হতোনা। তাদের এই কথা-বার্তা বা উক্তি ভিত্তিহীন। তাদের এ ধরণের কথাবার্তা বা ভিত্তিহীন ধারণা মনের খেদ বা আক্ষেপ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবন-মৃত্যুর মালিক তো আল্লাহ তা'লাই। অতএব হে মুমিনেরা! তোমরা এসব অসংলগ্ন কথাবার্তা বা উক্তি কেন কারো এবং মৃত্যু সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত ধারণা কেন করো। কেউ অভিযানে বা সফরে বের হোক বা না হোক যদি তার ভাগ্যে দূর্ঘটনায় পড়া বা আহত হওয়া লিখা থাকে, তাহলে তো সে অন্যভাবেও আহত হতে পারে। আবার যুদ্ধে যাক বা না যাক, যদি তার মৃত্যু সময় এসে পড়ে তাহলে সেতো যুদ্ধে না যেয়েও মৃত্যুবরণ করতে পারে! কেউই মৃত্যুর হাত থেকে রেহায় পাবে না-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায়ও নেই। যেমন- মহান আল্লাহ্ একই সূরার ১৪৫ নং আয়াতে বলেন- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً

"আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কেউ মৃত্যু বরণ করতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।"

সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই মানুষ মরে এবং বাঁচে। তিনি যা ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন তা টলাবার কারো ক্ষমতা নেই।

বর্তমান সমাজেও দেখা যায়, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন কিংবা আত্মীয়-স্বজন ইসলামী আন্দোলন করলে কিম্বা আন্দোলনের কোনো কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করলে, আর যদি সেই আন্দোলনে বা কর্মসূচীতে কোনো ঝুঁকি থাকে তাহলে একই ভাবে অভিভাবকরা বাড়ী হতে বের হতে দেয় না, আন্দোলন করতে বারণ করে, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসূচীতে যেতে বাধা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

যারা এরূপ করে এবং ধারণা করে যে, যদি সে এসব করে তাহলে আহত হতে পারে কিংবা নিহতও হতে পারে অথবা জেল-যুলুম হতে পারে। এ ধরনের ধারণা বা কাজ কোনো মুমিন করতে পারে না, এটা কুফরী ধারণা বা কাজ। আল্লাহ তা'লা যদি ভাগ্যে লিখে রাখেন তাহলে তো অন্য ভাবেও সে আহত অথবা নিহত হতে পারে কিংবা জেলে যেতে পারে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিহত (শহীদ) হয় তাদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেন-

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা (স্বাভাবিকভাবে) মারা যাও তাহলে তোমরা আল্লাহর যে রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে তা এরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার চেয়ে উত্তম।

অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হওয়া বা মরে যাওয়া তাঁর ক্ষমা ও করুণা লাভেরই মাধ্যম এবং এটা নিশ্চিতভাবে দুনিয়া ও তার সমুদয় জিনিস হতে উত্তম। কেননা, এটা ক্ষণস্থায়ী এবং ওটা চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী জিনিসের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী জিনিস বা মর্যাদা একেবারেই মূল্যহীন। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় বা মারা যায়, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে এবং হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ একই সূরার ১৬৯ আয়াতে উল্লেখ করেন-

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتاً ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে রিযিক লাভ করে থাকে।"

হাদীস শরীফে শহীদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন। "নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ-ই দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে) থাকবে। সে

www.pathagar.com

ফিরে এসে দশ দশবার শহীদ হবার জন্য আকাংখা করবে।কেননা, বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে।" (সহীহুল বুখারী)

অন্য হাদীসে শহীদের অসংখ্য মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। "হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দি কারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে। যেমন -

১. প্রথম রক্তপাতেই তার সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে।

২. জান্নাতে তাকে তার স্থান দেখানো হবে।

৩. তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে।

৪. বড় ধরনের বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

৫. তার মাথায় আকর্ষণীয় একটি মুকুট পরানো হবে যার এক একটি মনিমুক্তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতে উত্তম হবে। আর টানা টানা চোখ বিশিষ্ট ৭২ জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে।

৬. তাকে তার ৭০ জন আত্মীয়ের শাফায়া'তের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। (মিশকাত)

এভাবে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য তার পথে নিহত হবে তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে অসংখ্য মর্যাদা দেয়া হবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষ যেভাবেই মৃত্যু বরণ করুক না কেন সকলকে তার সামনেই সমাবেত হতে হবে বলে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন- وَلَئِنْ مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لاَ اِلَى اللهِ تُحْشَرُوْنَ

আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো কিংবা যুদ্ধে নিহত হও তবে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকেই সমবেত করা হবে।

অর্থাৎ মানুষ স্বভাবিক ভাবে বিছানাই শুয়ে মৃত্যু বরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ-ই হোক, যেভাবেই দুনিয়ার জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করুক না কেন, অবশ্যই সকলকে আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে। কেউ-ই তার সামনে হাজির হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে না। তারপর তারা তাদের দুনিয়ার কর্মের ফল স্বচক্ষে দেখতে পাবে,তা ভালো কাজই হোক আর মন্দ কাজই হোক। আর তা যতো ছোটই হোক বা বড়ই হোক, সমস্ত আ'মল তার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে।

www.pathagar.com

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা স্বীয় নবী (সঃ) ও মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

(হে নবী!) এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ যে, আপনি তাদের প্রতি রহম দেলের। যদি আপনি কর্কষ ভাষী ও কঠোর দেলের হতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব আপনি তাদের ত্রুটি মাফ করে দিন ও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

ওহুদ যুদ্ধে কোনো কোনো সাহাবীর পদস্খলন এবং যুদ্ধের মাঠে প্রিয় নবী (সঃ) কে ছেড়ে চলে যাবার ফলে মহানবী (সঃ) অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন-যদিও স্বভাবসূলভ ভাবে ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার কারণে তিনি সাহাবীদের প্রতি কোনো ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেননি এবং কোনো প্রকার কঠোরতাও করেননি। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাহাবাগণের মনোস্তষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ সৃষ্টি হয়েছিলো, সেসব বিষয় ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে সামনে আরো বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে গণতব্যস্থলে পৌঁছার লক্ষ্যেই অত্র আয়াতে মহানবী (সঃ) কে আরো বেশী কোমলতা, করুণা ও দয়া দেখানোর হিদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াতে প্রিয় নবী (সঃ) এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসলামী আন্দোলনকে গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে সঙ্গী-সাথীদের বিষয়ে কতিপয় দিক নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আয়াতের প্রথমেই এক বিস্ময়কর ভঙ্গিতে বলা হয়েছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ "এটা আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী যে", বলে এখানে দু'টি তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

এক. নবী করীম (সঃ) কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।

দুই. হে নবী (সঃ)! এসব গুণ বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফল। কারো ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়। 'রহমত' শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মাহাত্ম ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়েকিরামদের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং নবী করীম (সঃ) এর জন্যও রয়েছে। আর এই রহমতের কারণেই হে নবী! আপনাকে বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্টে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। যেমন-

প্রথমত ঃ لِنْتَ لَهُمْ - "আপনি তাদের প্রতি নরম দেলের।" অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! আল্লাহর রহমতে আপনি নরম দেলের-কোমল স্বভাবের। এখানে আল্লাহ তা'লা স্বীয় নবীর (সঃ) উপর ও মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নবী (সঃ) কে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বহুদূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নবী (সঃ) এর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর দয়া না হলে নবীর দেল এতো কোমল হতো না।

দ্বিতীয়ত ঃ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

"আর যদি আপনি কর্কষভাষী এবং কঠোর দেলের হতেন তাহলে তাঁরা আপনার পাশ থেকে সরে পড়তো।" এখানে فَظًّا শব্দের অর্থ 'কর্কষভাষী'। আর غَلِيْظَ الْقَلْبِ এর অর্থ হলো, 'কঠোর দেল বা কঠিন হৃদয়'। অর্থাৎ কারো বা কোনো নেতার পাশ থেকে সরে যাওয়া কিংবা মুখ ফিরে নেয়ার দু'টি খারাপ গুণের কথা বলা হয়েছে- একটি হলো, কর্কষভাষী বা মেজাজী। আর অপরটি হলো, কঠিন বা কঠোর দেল বা হৃদয়। অতএব হে নবী (সঃ)! আপনি যদি কর্কষভাষী ও কঠোর বা কঠিন

www.pathagar.com

হৃদয়ের হতেন তাহলে আপনার পাশ হতে আপনার সঙ্গী-সাথীরা বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো এবং আপনাকে ত্যাগ করে দূরে সরে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের অন্তরে আপনার প্রতি এমন প্রেম ও ভালবাসা স্থাপন করে দিয়েছেন যে, আপনার জন্য তাঁরা নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আর এই জন্যেই আল্লাহ্ তা'লাও তাঁদের দিক হতে আপনাকেও প্রেম ও নম্রতা দান করেছেন।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) কে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ - "অতএব আপনি তাঁদেরকে মাফ করে দিন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।"

অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! গীরিপথে পাহারায় নিয়োজিত ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ আপনার নির্দেশকে উপেক্ষা করে গীরিপথের পাহারা ছেড়ে দিয়ে গাণিমাতের মাল সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত হওয়ার এই ত্রুটি, আর তাঁদের এই ভুলের কারণেই ৭০ জন সাহাবীর শাহাদাৎ, আপনিসহ অসংখ্য সাহাবীর আহত হওয়া এবং আপনাকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে পলায়ন করায় আপনি যে মানসিক এবং শারিরীক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন এজন্য আপনি তাঁদের প্রতি কঠোর আচরণ না করে কোমলতা প্রদর্শন করুন এবং তাঁদের মানবিক দূর্বলতা ও ত্রুটিকে নিজেও মাফ করে দিন এবং তাঁদের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছেও মাগফিরাতের দোয়া করুন।

অতঃপর পরবর্তী বাক্যে নবী (সঃ) কে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে-

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ " আর তাঁদের সাথে কাজে-কর্মে পরামর্শ করুন।"

হে নবী (সঃ)! ইতোপূর্বে যেভাবে তাঁদের সাথে কাজে-কর্মে এবং কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাঁদের মনে প্রশান্তি আসে।

উল্লেখিত আয়াতে মহানবী (সঃ) কে প্রথমে তো সাহাবীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হিদায়েত দেয়া হয়েছে।

পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে সরাসরি দু'জায়গায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একটি হলো- এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো-

www.pathagar.com

সূরা আশ্ শুরা'র সে আয়াত যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ "তাদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" (আয়াত -৩৮) অর্থাৎ তারা যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ করবে, তেমনি ইসলামী সংগঠন পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও পরামর্শ গ্রহণ করবে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিবারীক কাজেও পরামর্শ করবে।

"সকল কাজে তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করো"-মহান আল্লাহর এই নির্দেশের কারণেই সাহাবীগণকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে মহানবী (সঃ) সকল কাজে তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর বিভিন্ন কাজে পরামর্শ গ্রহণ করার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যেমন- বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুবাহিনীর দিকে ধাবমান হওয়ার জন্যে তিনি সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ নেন। তখন তাঁরা বলেছিলেন, হে নবী (সঃ)! যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ারও নির্দেশ দেন, তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই দ্বিধাবোধ করবো না। আর যদি আপনি আমাদেরকে 'বাবকুল গামাদ' পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেন, তাহলেও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে রওয়ানা হয়ে যাবো। আমরা হযরত মুসা (আঃ) এর সাথীদের ন্যায় 'তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকছি'-এরূপ কথা কখনও মুখে আনবো না। বরং আমরা আপনার ডানে-বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করবো। এভাবে যুদ্ধে অবতরণের জায়গা কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ করেন। এতে হযরত মুনজির ইবনে আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, আগে বেড়ে তাদের (শত্রুদের) সামনে হতে হবে।

অনুরূপভাবে ওহুদের যুদ্ধেও পরামর্শ নেন যে, মদীনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, না বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে ? অধিকাংশ লোক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মতামত দেন। ফলে তিনি তাই করেন।

www.pathagar.com

পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, মদীনার উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গিকারে বিরোধী দলের সাথে সন্ধি করা হবে, কি হবে না? হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইবনে মুআজ (রাঃ) এটা প্রদানে অস্বীকার করেন এবং তিনিও এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সন্ধি করা থেকে বিরত থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়াতেও তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, মুশরিকদেরকে আক্রমন করা হবে কি, হবে না? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, উমরা পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহর রাসূল (সঃ) এই মতই গ্রহণ করে নেন।

মুনাফিকরা যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন, 'হে মুসলমান ভাইয়েরা! যেসব লোক আমার স্ত্রীর দুর্ণাম করছে তাদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে এই বিষয়ে পরার্মশ দাও। আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তো আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নেই। আর যে লোকটার সাথে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর কসম! সেও তো আমার মতে ভালো লোক বটে। হযরত আয়িশা (রাঃ) কে পৃথক করার বিষয়ে তিনি হযরত আলী ও হযরত উসামা (রাঃ) এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

মোট কথা যুদ্ধ সম্পর্কীয় কাজ এবং অন্যান্য কাজেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাগণের সাথে পরার্মশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। (ইবনে কাসির)

এভাবে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীদের নিকটও পরামর্শ নিতেন, যেমন সিরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধির একমূখী অপমানকর চুক্তি যখন সাহাবাগণ মেনে নিতে পারছিলেন না, এমতাবস্থায় চুক্তি মোতাবেক মক্কায় না গিয়ে মদীনায় ফিরে যাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের হুদায়বিয়াতেই মাথা মুন্ডণ ও কুরবানী করার ঘোষণা দিলেন, তখন অপমান এবং মনোবেদনার কারণে সাহাবাগণ তাঁর কথায় সাড়া না দেয়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) পেরেশান হয়ে তাবুতে প্রবেশ করেন ও তাঁর স্ত্রীর নিকট পরামর্শ চান তাঁর যুদ্ধের সফর সঙ্গী বিচক্ষণা স্ত্রী উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি নিজেই সেই কাজ আরম্ভ করে দিন, দেখবেন আপনার প্রাণপ্রিয় অনুগত

www.pathagar.com

সাহাবাগণও সেই আ'মল শুরু করে দিবেন। নবী করীম (সঃ) তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে তাই করলেন।

পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বাছাই ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যারতার সাথে পরামর্শ করা উচিত নয়। পরামর্শ দাতার জ্ঞান, দুরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, বিশ্বস্ততা ও অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যক্তি বাছাই করে পরামর্শ নেয়া উচিত। যেমন- সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায়, সে হবে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, পরামর্শ গ্রহণ করার উল্লেখিত এ আয়াতে (শায়খাইন) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ রয়েছে। (হাকিম) কেননা, এ দু'জন সহচর-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা। আর ঐ দু'জনই ছিলেন মুসলমানদের পিতৃতুল্য। (কালবী)

মুসনাদ-ই আহমাদে বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দু'জন সাহাবীকে বলেছিলেন, কোনো কাজে যদি তোমরা দু'জন একমত হয়ে যাও তবে আমি কখনও তোমাদের বিপরীত মত পোষণ করবো না।

পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে কল্যাণকর পরামর্শ দেয়া ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের নিকট কোনো পরামর্শ চায়, তখন যেন সে তাকে ভালো (কল্যাণকর) পরামর্শ দেয়।

(আল্লামা ইবনে কাসির)

পরামর্শের উপকারীতাঃ পরামর্শ করে কাজ করার উপকারীতা এবং কল্যাণকারীতা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে পরামর্শ করে কাজ করবে সে লজ্জিত হবে না।" (আল মুজামুস সগীর)

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, যদি কেউ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর যদি তা ভুলও হয়, তবুও সে একটি নেকী পাবে।

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরামর্শ করাকে রহমত বলে উল্লেখ করেছেন। (বায়হাকী)

পরামর্শ ছাড়া আমীরের শপথ বৈধ নয়। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ وَلاَ لَّذِيْ بَايَعَهُ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া আমীর হিসেবে বাইয়াত (শপথ) নিবে তার শপথ বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বাইয়াত গ্রহণ করবে তাদের বাইয়াতও বৈধ হবে না"।

(মুসনাদ-ই আহমাদ)

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ لاَخِلاَ فَةَ الاَّ عَنْ مَشْوَرَةً

"পরামর্শ ছাড়া কোনো খিলাফত হতে পারে না।" (কানযুল উম্মাল)

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষে মহান আল্লাহ তা'লা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরের নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন-

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অতঃপর (হে নবী!) যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়- عَزْمٌ শব্দের অর্থ কি ? জবাবে তিনি বলেন, জ্ঞানীদের পরামর্শক্রমে যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে তখন তা মেনে নেয়া। (ইবনে মিরদুইয়া)

অর্থাৎ পরামর্শদানকারী জ্ঞানী-গুণীদের মতামতের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে, সেই সিদ্ধান্তের উপর সিদ্ধান্তদানকারী আমীর বা নেতাকে অটল-অবিচল থাকতে হবে। সেইজন্য আয়াতে عَزَمْتَ (আযামতা) একবচন শব্দ ব্যবহার করে রাসূল (সঃ) কে বুঝিয়েছেন, عَزَمْتُم (আযামতুম) বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে সাহাবাদেরকে বুঝানো হয়নি। কেননা, নেতা তো হয় একজনই।

www.pathagar.com

অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! আপনি যখন আপনার সহচর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন সেই সিদ্ধান্তের উপর অটল-অবিচল থাকুন এবং সম্মিলিত এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করুন। কেননা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা ছাড়া কোনো পরিকল্পনা কিংবা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আর যারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন, মহব্বত করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সাহায্যও করেন।

হাদীসে বর্ণনা রয়েছে, যে কাজ পরামর্শ ছাড়াই করা হয় তাতে আল্লাহর সাহায্য থাকে না। আর যে কাজ পরামর্শ করে করা হয় তা বাস্তবায়নে আল্লাহর সাহায্য থাকে।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের উপর অটল-অবিচল থাকা ও আল্লাহর উপর ভরসা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অতঃপর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো পক্ষেই বিজয় হওয়া সম্ভব নয় উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

যদি তোমাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে এমন আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

পূর্বের আয়াতে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ঐ গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই এই আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে মুমিনরা! যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে

www.pathagar.com

থাকেন তাহলে এমন কোনো পরাশক্তি নেই যে, তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে, বরং তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদারীর সাথে বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর উপরই পূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করতে পারো। তিনি আরো সতর্ক করে দিয়ে বলেন,আর যদি আল্লাহ তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান বা ত্যাগ করেন অর্থাৎ সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেন, তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো শক্তি নেই যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! কাজেই প্রকৃত খাঁটি মুমিনদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

এ সম্পর্কে সূরা তাওবার ৫১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"(হে নবী!) আপনি বলুনঃ আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই পৌছবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"

আল্লাহর উপর মুমিনদের কিভাবে ভরসা করা উচিত সেই বিষয়ে একটি চমৎকার হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। "তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি। যদি তোমরা হক আদায় করে (আল্লাহর উপর) তাওয়াক্কুল বা ভরসা করতে তাহলে তিনি পাখির রিযিক দেওয়ার মতই তোমাদেরকেও দিতেন। পাখি তো সকাল বেলা খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।" (জামে'আত্ তিরমিযী)

সুতরাং মুমিন যদি আল্লাহর উপর এভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাদের হয়ে যাবেন এবং বিজয় অর্জিত হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার কোনো শক্তি নয় বরং পূর্ণভাবে তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১৫৬ থেকে ১৬০ নং পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াতের বিস্তারিত দারস পেশ করা হলো। এখন এতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষা রয়েছে তা আমরা আলোচনা করবো। কেননা, আল কুরআনের প্রতিটি আয়াত বা সূরা কেবল আল্লাহর রাসূল (সঃ) এবং সমসাময়িক তাঁর সাহাবাগণের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি বরং আল্লাহর নবীর মাধ্যমে গোটা বিশ্ব জাহানের মানবকুলের জন্যই নাযিল হয়েছে। তা যতই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক অথবা ডিজিটাল কিংবা প্রযুক্তির যুগ হোক না কেন? তাতে সকল কালের সকল যুগের মানুষের জন্যই শিক্ষা রয়েছে। অতএব আমরা এখন আলোচনা করবো এই আয়াতসমূহের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি কি ঃ

১. কোনো মুমিনের একথা বলা বা ধারণা করা উচিত নয় যে, পিতা বা ছেলে কিংবা আত্মীয়-স্বজন যদি অভিযানে বা সফরে না যেতো কিংবা বাইরে বের না হতো বাড়ীতে অবস্থান করতো, তাহলে সে দুর্ঘটনায় পড়তো না কিংবা মারাও যেতো না। অথবা একথা বলা বা ধারণা করা উচিত হবে না যে, যদি আমার পিতা/মাতা/ভাই/বোন/সন্তান-সন্ততি জিহাদে তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে জড়িত না থাকতো অথবা এ ধরণের কোনো কর্মসূচীতে যোগ না দিতো তাহলে সে আহত হতো না অথবা জেলে যেতো না কিংবা নিহত ও (শহীদ) হতো না। এসব কথা বা ধারণা হলো কুফরী কথা বা ধারণা। কোনো মুমিন এ ধরনের কথা বলতে বা ধারণা পোষণ করতেই পারে না। কেননা, জীবন-মরনের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। যার যখন যেখানে যেভাবে মৃত্যু লিখা থাকবে তখন তার সেখানে সেভাবে মৃত্যু হবেই, কেউই ঠেকাতে পারবে না।

২. মুমিনদের আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমরা যখন যে কার্জকলাপ-ই করি নাই কেন, আল্লাহ তা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরখ করছেন। আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে আমরা কোনো কিছুই করতে পারবো না-কোনোভাবেই আল্লাহর দৃষ্টিকে এড়াতে পারবো না।

www.pathagar.com

৩. যারা 'ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে যেয়ে নিহত হয় অর্থাৎ শহীদ হয় অথবা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থেকে শহীদ না হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুও হয় তাহলে তারা দু'টি মর্যাদা লাভ করবে। তার একটি হলো, তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হলো, মাগফিরাত বা ক্ষমা লাভ করবে, যা দুনিয়াদারদের অর্জিত ও সঞ্চিত সম্পদের চেয়েও অনেক অনেক উত্তম।

৪. প্রতিটি মুমিনের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যারা দুর্ঘটনায় পড়ে কিংবা স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করে এবং যারা জিহাদ-সংগ্রাম করতে করতে নিহত হয় বা শহীদ হয়, সকলকেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে জমায়েত হতেই হবে।

৫. আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে যদি আনুগত্যশীল কর্মীরা বা অধিনস্থরা মানবিক দূর্বলতা অথবা দুষমনদের আক্রমনের ভয়ে কিংবা অনুকূল পরিবেশে আবেগের বসে সীমালংঘণ বা ভুল-ত্রুটি কিংবা অপরাধ করে ফেলে তাহলে আমীর বা নেতাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে।

ক. তাদের প্রতি কর্কষভাষা প্রয়োগ কিংবা কঠোরতা আরোপ না করে সহানুভুতিশীল হতে হবে।

খ. যদি তারা তাদের স্বীয় দূর্বলতা, ভুল-ত্রুটি ও অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে মাফ করে দিতে হবে এবং তাদের এই ঈমানী দূর্বলতা, ত্রুটি ও অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে হবে। তবে যদি কেউ নিজের দূর্বলতা, ভুল কিংবা অপরাধ স্বীকার না করে এবং অনুতপ্ত না হয়, তাহলে তাদের বিষয়ে সাংগঠনিকভাবে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

গ. ইসলামী সংগঠনের উপর থেকে নীচ স্তর পর্যন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যে কোনো সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে হতে হবে। এছাড়াও পারিবারীক, সামাজীক এবং অন্যান্য সংস্থার কাজের ক্ষেত্রেও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে পরামর্শ দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নের নীতিমালা মেনে চলতে হবে। যেমন-

www.pathagar.com

* যাদের সাথে পরামর্শ করা হবে তারা জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দুরদর্শী হবে ও তাদের মধ্যে পরিবেশ বিশ্লেষণী শক্তি থাকতে হবে এবং তারা বিশ্বস্ত হবে। এধরনের মানসম্মত মহীলাদের সাথেও পরামর্শ করা যাবে। যেমন নবী করীম (সঃ) হুদায়বিয়ায় তাঁর স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

* যারা পরামর্শ দেবেন তাদেরকে অবশ্যই ভালো কল্যাণকর পরামর্শ দিতে হবে। মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুট-কৌশল রাখা যাবে না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা নিয়েই পরামর্শ দিতে হবে।

* পরামর্শ করে কোনো পরিকল্পনা কিংবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পরামর্শ দাতা যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নিবে, তেমনি গৃহীত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তার সতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণও থাকতে হবে।

* পরামর্শের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেই সিদ্ধান্তের উপর সভাপতি বা আমীর বা নেতাকে অনঢ় থাকতে হবে, তাতে যতই প্রতিকূল পরিবেশ হোক না কেন। বার বার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা নেতৃত্বের দূর্বলতারই লক্ষণ। তবে হাঁ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কর্মকৌশল পরিবর্তন করা যেতে পারে। আশপাশের যাকেই বিশস্ত এবং যোগ্য পাওয়া যাবে তাদের সাথে তাৎক্ষণিক ভাবে পরামর্শ করে নিতে হবে। যদি এমন পরিবেশ হয় যে, সেই সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে নেতৃত্ব এককভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। তবে পরামর্শ ভিত্তিক গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে নেতৃত্ব পিছে সরে আসবেন না।

* পরামর্শের ভিত্তিতে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং তারই সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়ন করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

৬. প্রতিটি মুমিন মুজাহীদের এই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া দ্বীন বিজয় হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে বৈষয়িক কোনো বস্তু বা শক্তির উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো শক্তি বা পরাশক্তি নেই যে বিজয়ের জন্য সাহায্য করতে পারে। এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ যদি বান্দাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ত্যাগ করে সাহায্য বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কোনো শক্তি নেই যে, তাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

www.pathagar.com

৭. মানুষ হচ্ছে তাড়াহুড়ো প্রবণ! কোনো কাজের ফলাফল তাৎক্ষণিক পেতে চায়। কিন্তু এটা ধৈর্যশীল মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। ধৈর্যশীল প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হলো, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা, তারপর ফলাফল পাওয়ার জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা।

আহ্বান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের ১৫৬ থেকে ১৬০ পর্যন্ত আয়াতের যে দারস পেশ করা হলো এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ত্রুটি বা বাড়াবাড়ি হয়ে যাই, তার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমরা পালন করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি।

www.pathagar.com

পাঁচ

হকদারের আমানত ফেরৎ দেয়া। ন্যায়নীতির সাথে মিমাংসা করা। আল্লাহ, রাসূল এবং আমীরের আনুগত্য করা। কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়া।

সূরা আন্ নিসা- ০৪

আয়াত-৫৮-৫৯

نَحْمَدَهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا لا وَاِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكَمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا م بَصِيْرًا ٥ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ٥

সরল তরজমা ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৫৮) (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারের হাতে ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-মিমাংসা করার সময় আ'দল বা ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ

www.pathagar.com

দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং সেইসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতোবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও অতি উত্তম।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِنَّ اللّٰهَ - নিশ্চয়ই আল্লাহ। يَأْمُرُكُمْ - তোমাদের নির্দেশ দেন। اَنْ تُؤَدُّوْا - যেন তোমরা সমার্পণ করো/ফিরিয়ে দাও। اَلْاَمٰنٰتِ - গচ্ছিত সম্পদ। اِلٰى - দিকে/নিকট। اَهْلِهَا - উহার প্রাপক। وَ - এবং। اِذَا - যখন। حَكَمْتُمْ - তোমরা বিচার-মিমাংসা করো। بَيْنَ النَّاسِ - মানুষের মধ্যে। اَنْ تَحْكُمُوْا - যেন তোমরা ফয়সালা বা মিমাংসা করো। بِالْعَدْلِ - ন্যায়নীতির সাথে। اِنَّ اللّٰهَ - নিশ্চয়ই আল্লাহ। نِعِمَّا يَعِظُكُمْ - তোমাদের সদুপদেশ দেন। سَمِيْعًا - সবকিছু শুনেন। بَصِيْرًا - সবকিছু দেখেন। يٰاَيُّهَا - ওহে/হে। اَلَّذِيْنَ - যারা। اٰمَنُوْا - ঈমান এনেছো/ঈমানদাররা। اَطِيْعُوا اللّٰهَ - তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - এবং রাসূলের আনুগত্য করো। اُولِى الْاَمْرِ - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃত্বশীলদের। مِنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে। فَاِنْ - অতঃপর যদি। فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ -অতঃপর যদি তোমারা মতোভেদ করো। فِىْ شَىْءٍ -কোনো বিষয়ে। فَرُدُّوْهُ - তবে তা ফিরিয়ে দাও। اِلَى اللّٰهِ - আল্লাহর দিকে। اِنْ كُنْتُمْ- যদি তোমরা হয়ে থাকো। تُؤْمِنُوْنَ - তোমরা ঈমানদার। يَوْمَ الْاٰخِرِ -আখিরাতের দিনের।

ذٰلِكَ - ঐটা /এরূপ। خَيْرٌ - কল্যাণকর। اَحْسَنُ - অতি উত্তম। تَاْوِيْلًا - পরিণতি/পরিসমাপ্তি।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আমি আপনাদের খিদমতে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আন্ নিসা-র ৫৮ ও ৫৯ ২টি আয়াত তিলাওয়াত ও অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরাটির নামকরণ ঃ আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً এর نِسَاءً শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। نِسَاءً অর্থ হলো 'স্ত্রীলোক'। তবে এই নামকরণ কোনো শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি, বরং প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাদানী। তবে সূরাটি একই সময় নাযিল হয়নি। কয়েকটি ভাষণে নাযিল হয়েছে। সূরাটির বিষয় এবং ঘটনার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, ওহুদ যুদ্ধের পর অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক হতে পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়কালের বিভিন্ন সময় এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য ঃ মহানবী (সঃ) এর মদীনায় ইসলামী সমাজ গঠনের দু'তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর সূরাটি নাযিল হয় বিধায় এই সূরাতে ইসলামী সমাজের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কীত বিষয়গুলোই বেশী আলোচিত হয়েছে। এই সূরায় পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমাজের নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন, অর্থনৈতিক লেনদেনের পদ্ধতি এবং ঘরোয়া বিবাদ মিটানোর পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধের শাস্তির বিধান এবং মদ পান নিষেধ করা হয়েছে। পাক পবিত্রতার বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহ্দের সাথে পরহিজগার লোকদের সম্পর্ক কেমন হবে তা বলা হয়েছে। মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদের গুরুত্ব তুলে

www.pathagar.com

ধরা হয়েছে। মুসলিমদের দলীয় সাংগঠনিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 'আহলে কিতাব' তথা ইহুদী-খৃষ্টান এবং মুনাফিকদের কাজের সমালোচনা এবং তাদের বিষয়ে মুসলিমদেরকে সতর্ক-সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। কোনো সংবাদ পেলে তাৎক্ষণিক প্রচার না করে দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। ইহুদীদের অসংগত কাজের জন্য মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মদীনা থেকে বহিস্কারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ গোত্রের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করা হবে তার বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন করা হয়েছে। সূরার সবশেষে ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুশরিকদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মূল বক্তব্য ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বক্তব্যই হলো প্রাপকের আমানত ফেরৎ দেয়া। বিচার-মিমাংসার সময় ইনসাফ তথা ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করা। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আমীরের আনুগত্য করা এবং কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের দিকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আন্ নিসা-র বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলাম।এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা পেশ করছি। প্রথম আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

(হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার হকদারের হাতে ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা মানুষের মাঝে কোনো বিচার-মিমাংসা করার সময় 'আদল' বা ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

www.pathagar.com

এই আয়াতে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'লা দু'টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হলো হকদারের নিকট আমানত ফেরৎ দেয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার করা।

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতটি নাযিলের একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি হলো, ইসলামের পূর্বকাল থেকেই কা'বা ঘরের সেবা করাকে এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের কাজ মনে করা হতো। কা'বা ঘরের খিদমতের জন্য যারা মনোনীত হতো, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মধ্যে বিশেষ সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে গণ্য হতো। আর এই জন্যই বায়তুল্লাহ শরীফের বিশেষ খিদমত বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই হজ্জের মওসুমে হাজীদের 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবার দায়িত্ব মহানবী (সঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর উপর ন্যাস্ত ছিলো। একে বলা হতো 'সেকায়া'। এমনিভাবে অন্যান্য আরো কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব হুজুর (সঃ) এর অন্য চাচা আবু তালিবের উপর ছিলো। আর কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার দায়িত্ব ছিলো ওসমান ইবনে তালহার উপর।

এ বিষয়ে ওসমান ইবনে তালহা নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের দিন বায়তুল্লাহর তথা কা'বা ঘরের দরজা খুলে দিলে জনগণ তাতে প্রবেশের সুযোগ পেতো। হিজরাতের পূর্বে একবার মহানবী (সঃ) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহ্তে প্রবেশের উদ্দেশ্যে গেলে আমি (তখনও মুসলমান হয়নি) তাঁকে প্রবেশে বাধা দিলাম এবং অত্যন্ত বিরক্তি দেখলাম। কিন্তু মহানবী (সঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সাথে আমার কটুক্তিগুলো সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, 'হে উসমান! হয়তো তুমি একদিন বায়তুল্লাহ্র (আল্লাহর ঘরের) এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে।' তখন যাকে ইচ্ছা তাকে এই চাবি প্রদানের অধিকার আমারই থাকবে। আমি বললাম, যদি তাই হয়, তাহলে তো সেদিন কুরাইশরা অপমান অপদস্ত হয়ে পড়বে। হুযুর বললেন, না তা হবে না। বরং কুরাইশরা আযাদ (স্বাধীন) হবে এবং তারা হবে যথার্ত সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান চালালাম, তখন যেন আমার নিশ্চিত

www.pathagar.com

বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মূহুর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি ভালো দেখলাম না। তারা আমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার ভর্ৎসনা করতে লাগলো। কাজেই আমি আমার (মুসলমান হওয়ার) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজয় হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি চাইলে আমি তাঁকে তা দিয়ে দিলাম। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র উপর উঠে পড়লেন, তখন হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশে তার নিকট হতে জোর করে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুজুরের হাতে তুলে দেন। যা হোক, বায়তুল্লায় প্রবেশ করে সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। আর অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালিম-অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোনো অধিকার কারোর-ই থাকবে না। সাথে তিনি এই উপদেশ দিলেন যে, বায়তুল্লাহ্‌র সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ অর্জন করবে তা শরীয়তের রীতি অনুযায়ী ব্যবহার করবে। ওসমান ইবনে তালহা বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে আনন্দের সাথে আসছিলাম, তখন হুজুর (সঃ) আমাকে ডেকে পূর্বের মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে ওসমান! আমি যা বলেছিলাম তাই হলো না কি? তৎক্ষণাৎ আমার সেই কথাটি মনে হয়ে গেল হিজরাতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখবে।' তখন আমি আরজ করলাম, 'নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।' আর আমিও সেই মুহুর্তে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। (তাফসীরে মাযহারী)

হযরত ফারুকে আযম হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সঃ) বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

"হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারের নিকট ফিরিয়ে দাও।"

(তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে একটি দীর্ঘ ভাষণ দান করে সবেমাত্র বসে পড়েছেন- এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) একটু আগে বেড়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) চাবিটি আমাকে দিন, যেন বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের যমযমের পানি পান করানোর মর্যাদা এ দু'টোই এক জায়গায় একত্রিত হয়।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাবিটি তাকে দিলেন না। তিনি "মাকামে ইব্রাহীমকে" কা'বার ভিতর হতে বের করে কা'বার দেয়ালের সাথে মিলিয়ে রেখে লোকদেরকে বললেন ঃ এটাই আমাদের কিবলাহ।

অতঃপর তিনি তাওয়াফের কাজে লেগে পড়লেন। তিনি কেবলমাত্র দু'বার প্রদক্ষিণ করেছেন এমন সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) অবতীর্ণ হন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)- اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمٰنٰتِ এ আয়াতটি পড়তে আরম্ভ করেন। তখন হযরত উমরে ফারুখ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি এর আগে তো আপনাকে এ আয়াতটি পড়তে শুনিনি। তখন তিনি হযরত উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে তাকে চাবিটি দিয়ে দেন।

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানতসমূহ তার হকদারের নিকট ফিরিয়ে দাও।" এই আয়াতটি যদিও উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর হুকুম আ'ম বা সাধারণ। এই নির্দেশ সাধারণ মুসলমান হতে পারে কিংবা বিশেষ ভাবে ক্ষমতাসীন শাসকগণও হতে পারে। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হলো, এমন সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ এবং শাসক শ্রেণী উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। (মা'রিফুল কুরআন)

আমানতের প্রকারভেদ ঃ আয়াতের প্রথম নির্দেশ- اَمَانَاتْ (আ-মা-না-ত) শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করে সমস্ত প্রকারের আমানত বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন-রাষ্ট্রীয় আমানত, দায়িত্বের আমানত, ক্ষমতার আমানত, ভোটের আমানত, মর্যাদার আমানত, সম্পদের আমানত, কথার আমানত, গোপন বিষয় সংরক্ষণের আমানত ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা আল্লাহ তা'লার আমানত ঃ এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যতো পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে সেসবই আল্লাহ তা'লার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগদান এবং বরখাস্তের ক্ষমতা বা অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তারা হচ্ছেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে এমন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা বৈধ নয়, যে লোক সেই পদের জন্য যোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্বই হলো সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে যাচাই-বাছাই করে যোগ্য ব্যক্তিকেই সেই পদে নিয়োগ দান করা। তবে যদি পরিপূর্ণভাবে সেই পদের জন্য শর্ত মোতাবেক কোনো যোগ্য লোক না পাওয়া যায়, তবে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যে বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সততার দিক দিয়ে বেশী অগ্রবর্তী তাকেই নিয়োগ দেয়া। কেননা, বৈষয়িক যোগ্যতার কিছু ঘাটতি থাকলেও সততার কারণে তার সে ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে এবং তার এই সততার কারণে তার অধিনস্থরাও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না এবং সাধারণ মানুষ হয়রানি হবে না। বরং তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে।

আর যদি কোনো পদে অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতের অধিকারী হবে। হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি সে কাকেও তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা বিশেষ কোনো সম্পর্কের কারণে কোনো পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত) বর্ষিত হবে। না তার ফরজ (ইবাদত) কবুল হবে, না তার নফল ইবাদত। এমনকি জাহান্নামে সে নিক্ষিপ্ত হবে। (মা'রিফুল কুরআন)

অতএব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা থাকবে, তাদেরকে অবশ্যই গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী পদসমূহে সেইসব লোককেই নিয়োগ দিতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করা হবে। কোনো প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা এলাকা বা দলীয় বিবেচনায় অথবা ঘুষ-উৎকোচের বিনিময়ে যেন

www.pathagar.com

নিয়োগ দেয়া না হয়। নয়তো এর ভয়াবহ পরিণতি দুনিয়া এবং আখিরাতে ভোগ করতে হবে। তাতে যেমন আল্লাহর অভিসম্পাত পেত হবে তোমনি জনগণেরও অভিশাপ ভোগ করতে হবে।

আয়াতে আরো একটি নিয়োগের ক্ষেত্রে মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে- যা বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা হয়ে থাকে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সেটা হলো কোটা পদ্ধতি। যেমন, এক বিভাগ বা জেলা কিংবা এলাকার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারণ। এক এলাকার কোটায় অন্য এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তাতে প্রার্থী যতই যোগ্য হোক না কেন।

অপরপক্ষে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অথর্ব্য হোক না কেন তাকেই নিয়োগ দিতে হবে। পবিত্র আল কুরআনে পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, এসব পদ কারোর-ই ব্যক্তিগত বা এলকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা কেবলমাত্র এর যোগ্য হকদারকেই অর্পণ করতে হবে, তা সে যে এলাকার লোক হোক না কেন। অবশ্য কোনো এলাকা বা প্রদেশের শাসনের সুবিধার্তে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, যাতে বহুবিদ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, কাজের যোগ্যতা এবং সততা ও আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

বনী ঈসরাইলদের অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাদের একটি মৌলিক ও বড় দোষ ছিলো, তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদসমূহ এমনসব লোকদেরকে দেয়া শুরু করেছিলো, যারা ছিলো- অযোগ্য, অর্থব্য, সংকীর্ণমনা, অসৎ, চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, খিয়ানতকারী ও ব্যাভীচারী। ফলে এসব নেতৃত্বের কারণে গোটা সমাজের লোক অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। তাই মুসলমান নেতৃত্বকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্ব অথবা যে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে সৎ, যোগ্য, খোদাভীরু ও চরিত্রবান লোকদেরকেই নিয়োগ দান করবে।

সংবিধান সম্পর্কীত কয়েকটি মূলনীতি ঃ আয়াতের এই সংক্ষিপ্ত ব্যাক্যে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি 'তাফহীমূল কুরআন'- নিম্নরূপ বর্ণনা-এ করা হয়েছে। যেমন-

www.pathagar.com

১. আয়াতের প্রথম বাক্যে إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম বা নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ তা'লা। পৃথিবীর শাসকগণ কেবল তার আজ্ঞাবহ দাস। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ তা'লা।

২. সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হলো আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, যা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে।

৩. পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা কেবলমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে যেসব নীতিমালার অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে। যা পবিত্র আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

৪. এই আয়াতের দ্বিতীয় যে নির্দেশ তা হলো, বিচার-মিমাংসার জন্য যখন কোনো মামলা-মোকাদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমন কি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য করা যাবে না। বরং আ'দল ও ন্যায়নীতির মাধ্যমে ফায়সালা করে দিতে হবে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে রয়েছে, আল্লাহ তা'লার সমস্ত হক আদায় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- নামায, রোযা, কাফ্ফারা, নযর ইত্যাদি।

হযরত আলি (রাঃ) বলেন, যে যে জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে ঐ সবগুলোই আমানত। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, নারীর নিকট তার লজ্জাস্থান একটি আমানত। (স্বামী ছাড়া কেউ ভোগ-ব্যবহার করতে পারে না।)

হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, তোমার ও অপরের মধ্যে যে লেনদেন হয় ঐসবগুলোই আমানত। (ইবনে কাসীর)

হকদারের আমানত ফেরৎ দেয়ার তাগাদা ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন হকদারের আমানত তার কাছে ফেরৎ দেয়ার"।

এই নির্দেশের সারমর্ম হলো এই যে, যার দায়িত্বে কোনো আমানত থাকবে হকদারের কাছে তার আমানত ফিরিয়ে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। যা নবী করীম (সঃ) যাহিলী যুগে উসমান বিন তালহার নিকট গচ্ছিত কা'বা ঘরের চাবি মক্কা বিজয়ের পর যখন নবী করীম (সঃ) এর হাতে অর্পিত হয়, তখন নবী করীম (সঃ) এর হাতে এই চাবি অর্পণের সময় উসমান ইবনে তালহা (অমুসলমান থাকার পরেও) বলেছিলো, আল্লাহর আমানতের সঙ্গে দিচ্ছি। (ইবনে কাসীর) আর উক্ত চাবি হাতে নিয়ে নবী করীম (সঃ) কা'বা ঘরে প্রবেশ করে রক্ষিত সকল মূর্তি নিজ হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে পানি ঢেলে দিয়ে পাকসাপ করার পর কা'বা ঘর থেকে বের হলে আমানত হকদারের কাছে ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হয়। নবী করীম (সঃ) এই নির্দেশ পাওয়ার ফলে কা'বা ঘরের চাবি চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) চাইলেও তাদেরকে না দিয়ে নবীকে ভর্ৎসনাকারী (তখনও অমুসলিম) ওসমান বিন তালহার নিকট বায়তুল্লাহর চাবি রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্পণ করেন। আর এই চাবি ফিরে পেয়ে সাথে সাথে কালিমা পড়ে ওসমান বিন তালহা মুসলমান হয়ে নবীর সাহাবাগণের কাতারে সামিল হয়ে যান।

গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য আমানত ফেরৎ দেয়ার তাগাদা সম্বলিত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে তোমার সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শণ করে, তুমি তার গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী ফেরৎ দাও এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

(মুসনাদ-ই আহমাদ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) কোনো ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি- لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمْنَتَالَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا اَحْدَلَهُ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার দ্বীন নেই।"

(শোআ'বুল ঈমান)

www.pathagar.com

আমানত রক্ষা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য, আবার খিয়ানত করা মুনাফিকীর বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কালামে হাকীম সূরা মু'মিনুনে মুমিনদের যে সাতটি গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দু'টি গুণ হলোঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِم وَاَعْدِهِمْ رَاعُوْنَ

(তারাই মুমিন!) "যারা তাদের আমানতসমূহ এবং প্রতিশ্রুতিসমূহ সংরক্ষণ করে।"

আবার সহীহ বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মুনাফিকদের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে একটি বৈশিষ্ট বলা হয়েছে, এরূপ-وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ "আর যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় তখন তা সে খিয়ানত করে"।

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আমানতের হক আদায় না করার পরিণতি ঃ হক বা প্রাপকের হক আদায় না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লা শুধু মানুষ কেন এক পশুকে আর এক পশু দ্বারা তার প্রাপ্য হক আদায় করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এমন কি শিংওয়ালা ছাগল কোনো শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও করিয়ে দেয়া হবে।" (ইবনে কাসীর)

মুসনাদ-ই ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে- "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, সাক্ষ্য দানের কারণে সমস্ত পাপ মুছে যায়, কিন্তু আমানত মুছে যায় না। যদি কোনো লোক আল্লাহর পথে শহীদও হয়ে থাকে তাকেও কিয়ামতের দিন আনা হবে এবং বলা হবে আমানত আদায় করো। সে উত্তরে বলবে এখন তো দুনিয়ায় নেই, সুতরাং আমি কোথা থেকে আমানত আদায় করবো? অতঃপর সে ঐ জিনিস জাহান্নামের তলদেশে দেখতে পাবে এবং তাকে বলা হবে ওটা নিয়ে এসো। তখন সে তা তার ঘাড়ে বহন করে চলতে থাকবে। কিন্তু ওটা পড়ে যাবে এবং সে পুনরায় ওটা নিতে যাবে। এভাবে সে ঐ শাস্তিতেই জড়িত থাকবে।"

(ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

অতঃপর অত্র আয়াতের দ্বিতীয় হুকুম ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-মিমাংসা করবে তখন আ'দল বা ন্যায়নীতির সাথে করবে।

উল্লেখিত আয়াতে প্রথম হুকুম প্রকৃত প্রাপকের কাছে আমানত পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়ার পর পরবর্তী এই বাক্যটিতে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশ দু'টির মধ্যে আমানত পরিশোধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সম্ভবত ঃ এই হতে পারে যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী পদসমূহ কিংবা বিচার ব্যবস্থায় সেসব লোককেই নিয়োগ দিতে হবে যারা সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্য। যারা সৎ, খোদাভীরু, আমানতদার। যদি এসব লোক নিয়োগ করা হয় তাহলেই কেবলমাত্র জনসাধারণ আ'দল বা ন্যায়বিচার লাভ করবে। আর যদি স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোনো সুপারিশ অথবা ঘুষ বা দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য, অথর্ব্য, অসৎ, খোদাবিমুখ, আত্মসাতকারী ও অত্যাচারী লোককে কর্মকর্তা বা বিচারক নিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে কোনো ভাবেই আ'দল বা ন্যায় বিচারের আশা করা যায় না। সরকার যদিও একান্তভাবে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবুও তাদের পক্ষে সেই লক্ষ্য অর্জন করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। কারণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এরাই হলো রাষ্ট্রের কর্ণধার।

এতো গেল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা। এছাড়া আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ন্যায় বিচার বা আ'দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন- একজন স্বামীর একাধীক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রতি আ'দল বা ইনসাফ করতে হবে। ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তানদের প্রতি ইনসাফ করতে হবে। সমাজের কোনো সালিস-দরবারে আ'দল বা ন্যায়বিচার করতে হবে ইত্যাদি।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময় বনি ইসরাঈলরা যেভাবে আমানতের খিয়ানত করতো, তেমনি তারা আ'দল বা ন্যায়নীতির বিষয়েও অত্যন্ত দূর্বল ছিলো। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা ঈমান বিরোধী কাজ করতো। ইনসাফ বা ন্যায়নীতির গলায় তারা ছুরি চালাতে দ্বিধাবোধ করতো না। যা মুসলমানেরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলো। তাই মহান আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা ওদের মতো অবিচারক হয়ো না। কারো সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা যাই থাক না কেন সর্ব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফয়সালা করবে।

ন্যায়বিচারকের প্রতিদান ও মর্যাদা ঃ

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'লা বিচারকের সাথে থাকেন যে পর্যন্ত তিনি ন্যায়বিচার করেন। যখন সে অত্যাচার করে তখন তারই দিকে তা ফিরিয়ে দেন। অন্য এক হাদীসে রয়েছে, এক দিনের ন্যায়বিচার চল্লিশ বছরের ইবাদতের সমান।

(ইবনে কাসীর)

ন্যায়বিচারক শাসককেও আল্লাহ্ তা'লা হাশরের ময়দানে মহা সম্মানিত করবেন। অর্থাৎ যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেই কঠিন দিনে আল্লাহ্ সাত শ্রেণীর লোককে আশ্রয় দেবেন তার মধ্যে প্রথম শ্রেণী-ই হলো- اِمَامٌ عَادِلٌ ন্যায়বিচারক শাসক।

এই জন্য সকল স্তরের বা সকল পর্যায়ে বিচার মিমাংসাকারীকে সকল বিচারকের বিচারক মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি খেয়াল রেখে তাঁকে ভয় করেই বিচার মিমাংসা করা অপরিহার্য্য। তাই আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'লা উপদেশ দিয়ে বলেন- اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সদুপদেশ দান করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে প্রকৃত হকদার এবং যোগ্য লোকদের হাতে সকল পর্যায়ের আমানত তুলে দেয়া ও সকলের ক্ষেত্রে আ'দল বা ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিচ্ছেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উত্তম ও কল্যাণকর উপদেশ।

www.pathagar.com

আয়াতের সবশেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللهَ سَمِيْعًا ,بَصِيْرًا

নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

এখানে মুসলমানদের সতর্ক ও সাবধান করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, হে মুসলিম সমাজ, আমানত ও ইনসাফ সম্পর্কে তোমরা যাই কিছু বলো বা কারো না কেন, তিনি সবকিছুই শুনছেন এবং সবকিছুই দেখছেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا يُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আর আনুগত্য করো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন ছিলো শাসকশ্রেণী, তেমনি দ্বিতীয় এই আয়াতে সাধারণ মুসলিমদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং তোমাদের নেতৃত্ববর্গের আনুগত্য করো।"

আয়াতের শানে নুযুল ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট নৌবাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা ইবনে কায়েস (রাঃ) কে প্রেরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ইবনে কাসীর)

মাওলানা মওদুদী (রঃ) তাঁর তাফসীরের কিতাব 'তাফহীমূল কুরআনে' উল্লেখ করেন যে, এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রথম নম্বর ধারা। এখানে কতকগুলো নীতিমালা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে।

মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ নীতিমালাগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে বলেন-

www.pathagar.com

এক. أَطِيْعُوا اللهَ "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো।"

অর্থাৎ এই নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রকৃত আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'লা। একজন মুসলিমের প্রথম পরিচয় হলো, সে একজন আল্লাহর বান্দাহ্, এরপর সে অন্য কিছু। সুতরাং একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ জীবন ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য হচ্ছে বিনাশর্তে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর আদেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসরণ কেবলমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের বিপরীত হবে না, বরং তার অধীন এবং অনুকূল হবে। যদি এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী কোনো আনুগত্য হয়, তাহলে সেই আনুগত্যের শৃংখল ভেঙ্গে ছুড়ে ফেলতে হবে। একথাটিকে নবী করীম (সঃ) এভাবে ব্যক্ত করেছেন- لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "স্রষ্টার নাফরমানি করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের উপর আর কোনো আনুগত্য নেই। বরং সমস্ত আনুগত্যই হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ সকল আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু হবে আল্লাহ তা'লা।

দুই. وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ "এবং আনুগত্য করো রাসূলের।"

অর্থাৎ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের পরই দ্বিতীয় মূলনীতি হলো রাসূলের আনুগত্য। এটি কোনো স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি।

রাসূলের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধি-বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌছার একমাত্র বিস্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। কাজেই আমরা কেবলমাত্র রাসূলে করীম (সঃ) এর আনুগত্য করার পথ ধরেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি। রাসূলে করীম (সঃ) এর সার্টিফায় এবং প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহর কোনো আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাসূলের আনুগত্য মানেই আল্লাহর আনুগত্য। আর তাঁকে প্রত্যাখান মানেই আল্লাহকে প্রত্যাখান যা বিদ্রোহের সামিল। এ বিষয়ে মহানবী (সঃ) এর স্পষ্ট ঘোষণা-

www.pathagar.com

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَد اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللهَ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে যেন আল্লাহরই নাফরমানি করলো।"

অতঃপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আরো একটি মূলনীতি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন,

তিন. وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ "আর আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের।"

উপরোক্ত দু'টি আনুগত্যের পর তাদেরই অধীনে আরো একটি আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। আর তা হলো মুসলিম সমাজে যারা "উলিল আমর" তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী তাদের আনুগত্য করা।

উলিল আমর কে? ঃ আভিধানিক অর্থে- اُوْلِى الْاَمْرِ এর অর্থ হলো, সেসব লোক যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে বা কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে। এ বিষয়ে মুফাস্সীরগণের কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন 'উলিল আমর' হলো, ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়। তারাই হচ্ছেন মহানবী (সঃ) এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দ্বীনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত।

২. মুফাস্সীরগণের অপর এক জামায়াত যাদের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণও রয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'উলিল আমর' এর অর্থ হচ্ছে, সেসব লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। (মা'রিফুল কুরআন)

৩. তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উলিল আমর' হলো, ওলামা ও শাসক উভয় শ্রেণীকেই বুঝায়। কারণ নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

৪. তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কাজের বিষয়ে দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই 'উলিল আমর' এর অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়ে কিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন, আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে পারেন অথবা আদালতের বিচারকগণ হতে পারেন কিংবা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ সরদার প্রধানরাও হতে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোনো পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যই অধিনস্থদের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবেন।

'উলিল আমর' এর আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ ঃ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য হবে নিঃসর্ত। কিন্তু 'উলিল আমর' বা দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের আনুগত্য হবে শর্ত সাপেক্ষে। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

ক. প্রথম শর্ত হলো, তাঁকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।

খ. দ্বিতীয় শর্ত হলো, তাঁকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হতে হবে।

গ. তৃতীয় শর্ত হলো, কেবলমাত্র মা'রুফ বা সৎকাজে আনুগত্য করা যাবে।

উলিল আমরের আনুগত্যের বিষয়ে পবিত্র আল কুরআনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করলেও হাদীসে তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন- মহানবী (সঃ) বলেনঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْ مَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য তা তার পছন্দ হোক বা না হোক যে পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির কাজে নির্দেশ দেয়া হয়। আর যখন তাকে নাফরমানির কাজে নির্দেশ দেয়া হবে তখন তা যেমন শোনাও যাবে না তেমনি মানাও যাবে না।"

(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

আল্লাহর নাফরমানির কাজে কোনো আনুগত্য নেই ঃ হাদীসে বলা হয়েছে-

لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَاالطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

"আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানির কাজে কোনো আনুগত্য নেই, বরং আনুগত্য করতে হবে শুধুমাত্র মা'রুফ বা বৈধ ও সৎকাজে।"

(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে ইবনে কাসির মুসনাদ-ই আহমাদ এর বরাত দিয়ে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেনঃ রাবী বলেন, কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন আনসারীকে তার নেতৃত্ব প্রদান করেন। একবার তিনি সৈন্যদের উপর কোনো এক ব্যাপারে ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি বলেন, তোমরা জ্বালানি কাঠ জমা করো। তারপর তিনি আগুন দিয়ে কাঠগুলোকে জ্বালিয়ে দেন। অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। তখন একজন যুবক সৈনিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, আপনারা আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর রাসূলের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। তাই আপনারা এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূল (সঃ) এর সাথে স্বাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনি যদি আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন, তাহলে তাতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা যদি আগুনে ঝাপ দিতে তাহলে আর কখনো সেই আগুন থেকে বের হতে পারতে না (অর্থাৎ তা হতো আত্মহত্যা। আর তার ফলে তোমাদেরকে চিরদিন জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হতো)। জেনে রেখো, আনুগত্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজেই রয়েছে।" (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও হাদীসটি হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে)

ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন হবে না ঃ নেতৃত্ব যেহেতু পরিবর্তনশীল। তাই একজন ব্যক্তিই আজীবন নেতৃত্ব দিতে বা থাকতে পারেন না। ব্যক্তির অবশ্যই পরিবর্তন হবে। যেহেতু কতিপয়

www.pathagar.com

শর্তসাপেক্ষে ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, সুতরাং শর্ত ঠিক রেখে যদি ব্যক্তি পরিবর্তন হয়, তাহলে এর জন্য আনুগত্যের কোনো হেরফের হবে না, সেই ব্যক্তি তার পছন্দ হোক কিংবা না হোক। যদিও সে ব্যক্তি নাক কাটা হাবসী গোলামও হয়। এবিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন-

১. হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা শোন ও মেনে চলো যদিও তোমাদের উপর একজন ক্ষুদ্র মাথাবিশিষ্ট হাবসী গোলামকেও আমীর বানিয়ে দেয়া হয়"।

(সহীহুল বুখারী)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "আমার বন্ধু (সঃ) আমাকে নেতার কথা শোনার ও মেনে চলার উপদেশ দিয়েছেন যদিও সে একজন ত্রুটিযুক্ত হাত-পা বিশিষ্ট হাবসী ক্রীতদাসও হয়"।

(সহীহ মুসলিম)

৩. হযরত উম্মে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন; "যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে 'আ'মেল' বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'লার কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং মেনে চলবে।" (সহীহ মুসলিম) অন্য বর্ণনায় 'কর্তিত অঙ্গবিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস' এ শব্দগুলো রয়েছে।

আমীরের অপছন্দনীয় কাজে ধৈর্যধারণ করা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমীরের কোনো অপছন্দনীয় কাজ দেখে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে (আনুগত্য করে যায়)। আর যে ব্যক্তি জামায়াত হতে অর্ধহাত পরিমান দূরে সরে যাবে, সে জাহিলিয়াতের যুগের মৃত্যুবরণ করবে।"

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন হুজ্জত ও দলীল ছাড়াই আল্লাহ তা'লার সাথে স্বাক্ষাৎ করবে। আর যে এমন অবস্থায় মারা যাবে যে তার ঘাড়ে আনুগত্যের বন্ধন নেই, সে জাহিলিয়াতের যুগের মৃত্যুবরণ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের উপর এমন লোকও শাসন কর্তত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা 'মা'রুফ' (বৈধ) ও অনেক কথাকে 'মুনকার' (অবৈধ) পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকার কাজের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করেছে সেও বেঁচে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট রয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে সে (আল্লাহর দরবারে) পাকড়াও হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসন আমলে আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো ? হুজুর (সঃ) জবাব দেন, না যতক্ষণ তারা নামায পড়তে থাকবে (ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না)। (সহীহ মুসলিম)

যেহেতু নামায মুসলিম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করে, সুতরাং নামায ছেড়ে দিলেই কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। কেননা, শাসকদের দায়িত্ব শুধু নিজে নামায পড়া নয়, বরং সমাজ জীবনে নামায প্রতিষ্ঠিত রাখা। এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম সরদার হচ্ছে তারা যারা তোমাদের ঘৃণা করে এবং তোমরাও তাদের ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত (অভিশাপ) দিতে থাকো এবং তারাও তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না ? তিনি জবাব দেন; না, যতোদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে! না, যতোদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে।"

(সহীহ মুসলিম)

অতঃপর আয়াতের শেষে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আরো একটি মূলনীতি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

চার. فَاِنْ تَنَازَعتُم فِى شَئٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الا خِرِ

অতঃপর যদি কোনো বিষয়ে বা ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও-যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহ-ই হচ্ছে শরীয়তের মূল উৎস বা আইন। মুমিনদের মধ্যে অথবা মুসলিম শাসক ও জনগণের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বা ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা মিমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে ফায়সালা দেবে তা উভয় পক্ষকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। এই নীতি মেনে নেওয়া হলো আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মুমিন ও মুসলিম শাসক এবং নাগরিকের দায়িত্ব। এভাবে জীবনের সকল বিষয় ও ক্ষেত্রে একই নীতি অবলম্বন করতে হবে।

এ প্রসংগে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, জীবনের যাবতীয় সব বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে কিভাবে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতে পারে ? কেননা, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোনো নিয়ম-কানুনের উল্লেখই তাতে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি সৃষ্টি হয়েছে দ্বীনের মূলনীতিসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে। একজন কাফির ও একজন মুসলমানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যই হলো, কাফির অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। কিন্তু একজন মুমিন অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী নয়। সে আল্লাহর দাস। তাকে ইসলাম যতোটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে ততোটুকুই সে ভোগ ব্যবহার করতে পারে, এর বাইরে নয়। একজন কাফির তার নিজের মনগড়া আইন দ্বারা তার যাবতীয় বিষয়ের বিচার-ফায়সালা করে এবং ঐশি কোনো সমর্থনের বা অনুমোদনের কোনো তোয়াক্কাই করে না। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম তার প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন বা সমর্থন আছে কি না, তা দেখে। সেখান থেকে কোনো নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোনো নির্দেশ না পেলে কেবলমাত্র এ অবস্থায়ই সে স্বাধীন ভাবে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ লাভ করে। তবে এটা তার কর্মের স্বাধীনতা। তারপরেও এই স্বাধীনতা ভোগ করতে যেয়ে যেন কুরআন সুন্নাহ এবং ন্যায়নীতি পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ না হয়ে যায়। তার প্রতি তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

আয়াতের সর্বশেষে মহান আল্লাহ এই পদ্ধতিকে উত্তম বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً

এটিই একটি কল্যাণকর কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও অতি উত্তম।

অর্থাৎ একজন মুমিন যদি কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাহলে তাতে মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হবে না, সমাজে মানুষের শত্রু বৃদ্ধি পাবে না, হিংসা-বিদ্বেস সৃষ্টি হবে না, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিসৃংখলা সৃষ্টি হবে না। বরং একজন মুমিন আর একজন মুমিনের মধ্যে এবং শাসক ও নাগরীকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে। সমাজে শৃংখলা ফিরে আসবে। মানুষ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে ও শান্তি বিরাজ করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের গতি ফিরে আসবে। সাথে সাথে আখিরাতের জীবনও কল্যাণকর হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নিসা-র ৫৮ ও ৬৯ দু'টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। এখন এতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। তাই নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. সকল প্রকারের আমানত, তা কথা হোক বা দায়িত্ব-কর্তৃত্ব হোক কিম্বা চাকুরী হোক অথবা সম্পদ ইত্যাদি হোক না কেন, তা তার প্রকৃত হকদার বা প্রাপকের নিকট যথাযথ ভাবে পৌছিয়ে দিতে হবে।

২. কোনো চাকুরী কিংবা নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দেয়া বা অর্পণের জন্য টাকা বা অন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ না করা। যেমন, হাদীয়া বা উপঢৌকন কিম্বা ঘুষ অথবা উৎকোচ যাই হোক না কেন।

৩. কোনো শালিস বা বিচার-মিমাংসার ক্ষেত্রে- তা পারিবারিক হোক কিম্বা সামাজিক হোক অথবা শাসন ব্যবস্থায় হোক কিম্বা বিচার ব্যবস্থায় হোক, সকল ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি পার্থক্য না করে আ'দল ও ইনসাফ ভিত্তিক ফায়সালা করা।

৪. মহান আল্লাহ তা'লা সকলেরই স্রষ্টা। তাঁর আদেশ বা নির্দেশ সকলের জন্যই ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণকর। সুতরাং তাঁর আদেশকে সদুপদেশ মনে করে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

৫. প্রতিটি মানুষের এই খেয়াল ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আ'লিমুল গায়িব মহান আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি কথা শোনেন-তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য মনের গভীর তলদেশেরই কথা হোক। তাছাড়া এও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি আমাদের প্রতিটি কর্মপরিকল্পনা, কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা দেখে থাকেন ও পর্যবেক্ষণ করেন।

৬. নির্দিধায় নিঃসংকচে, নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে নিতে হবে এবং আনুগত্য করতে হবে। যেহেতু রাসূল (সঃ) ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এইজন্য তাঁর সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সকল সুন্নাহ বা রীতি-নীতিকে এবং নির্দেশকে মেনে চলতে হবে। কেননা, রাসূলকে অমান্য করলে আল্লাহকে অমান্য ও তাঁর নাফরমানী করা হয়।

৭. 'উলিল আমর', অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের আমীর বা নেতৃত্ব এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের শর্তসাপেক্ষে মা'রুফ কাজের আনুগত্য করতে হবে। শরীয়ত সম্মত কোনো নির্দেশ দিলে তা অবশ্যই মান্য করতে হবে তা পছন্দ হোক কিম্বা পছন্দ না হোক।

৮. ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন হবে না। যদিও সে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি গরীব হোক কিংবা নাক কাটা, কান কাটা কালা কুৎসিত হাবসী গোলামও হোক না কেন। কেননা, আল্লাহ্র নিকট সেই বেশী সম্মানী যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে চলে। (আল কুরআন)

৯. আমীর বা শাসক শ্রেণী কোনো অন্যায় কাজে নির্দেশ দিলে তা যেমন শোনা যাবে না তেমনি মানাও যাবে না। তার এই অন্যায় কাজের বিরোধীতা করতে হবে এবং নিয়মতান্ত্রীকভাবে তা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

১০. যতক্ষণ পর্যন্ত শাসকবৃন্দ নিজে নামায পড়বে এবং সমাজ জীবনে নামায প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করে যেতে হবে। আর যদি এ আ'মলটি ছেড়ে দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে শাসকবৃন্দ কেউ কেউ ব্যক্তি জীবনে নামায পড়লেও রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজে আল্লাহ্র দ্বীন ও নামায প্রতিষ্ঠিত নেই। সুতরাং সমাজ জীবনে দ্বীন ও নামায প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ্ আল

www.pathagar.com

কুরআনে ঘোষণা করেছেন- أَقِيْمُوا الدِّيْنَ "তোমরা দ্বীন কায়েম করো।" أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ "তোমরা সালাত বা নামায কায়েম করো।"

১১. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিচার ব্যবস্থায় আ'দল বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কোনো পার্থক্য করা যাবে না। মানুষ হিসেবে সকলেই মুমিনদের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে।

১২. কোনো বিষয়ে কিংবা ব্যাপারে মতোভেদ হলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিধান ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তাহলেই কেবলমাত্র বিতর্কের অবসান হতে পারে।

১৩. আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করলে ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলে যেমন দুনিয়াতে শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করবে, তেমনি আখিরাতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে চিরসুখী হওয়া যাবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নিসা-র ৫৮ ও ৫৯ দু'টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা পেশ করা হলো। এতে যদি আমার অজান্তে বা অজ্ঞাতে কোনো ভুল-ক্রটি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। 'অ'আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'।

ছয়

মতোবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমাধানের উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কঠোর থেকে কঠোরতর পরীক্ষা দিয়েই মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষা মোকাবেলার মাধ্যম হলো সবর ও আল্লাহর সাহায্য।

সূরা-আল বাকারা - ০২
আয়াত- ২১৩-২১৪

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللهُ
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْ
خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط
مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ

www.pathagar.com

الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْـــرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَاللّٰهِ قَرِيْبٌ ০

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (২১৩) প্রথম দিকে তো সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী ছিলো (পরবর্তীতে তারা মতোভেদ সৃষ্টি করে) তখন আল্লাহ্ সত্য-সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদ দাতা এবং বিপথগামীদের জন্য (জাহান্নামের) ভয় প্রদানকারী হিসেবে নবী পাঠালেন এবং তাঁদের সাথে নাযিল করলেন সত্য কিতাব, যাতে সত্য-সঠিক বিষয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতোবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিলো- তার চূড়ান্ত মিমাংসা করতে পারে। আসলে কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতোভেদ করেনি, বরং পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেস বশত ঃ তারাই সেই সত্য-সঠিক বিষয় নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলো, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঈমানদারদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতোবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। (২১৪) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে ? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আসে নাই। তাদের উপর এসেছে বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মসীবত, তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি তৎকালীন রাসূল এবং তাঁদের সংগী-সাথীরা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো, যেন রেখো! আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ كَـــانَ - ছিলো। النَّـــاسُ -মানুষ। اُمَّـــةً - জাতি/দল। وَاحِــدَةً - এক/একই। فَبَعَــثَ اللّٰهُ - অতঃপর আল্লাহ পাঠালেন। اَلنَّبِيِّنَ- নবীগণকে। مُبَشِّرِيْنَ -সুসংবাদদাতা। وَ - এবং। مُنْذِرِيْنَ -ভয় প্রদর্শনকারী। اَنْزَلَ- অবতীর্ণ করলেন। مَعَهُمْ - তাদের

সাথে। اَلْكِتٰبَ - গ্রন্থ। بِالْحَقِّ - সত্য সহকারে। لِيَحْكُمَ - যাতে মিমাংসা করতে পারে। بَيْنَ النَّاسِ - মানুষের মাঝে। فِيْمَا - যে বিষয়ে। اِخْتَلَفُوْا - তারা মতোভেদ করেছিলো। فِيْهِ - উহাতে/তাতে। اِلاَّ - ছাড়া/ ব্যতিরেকে। اَلَّذِيْنَ -যারা/যাদের। اُوْتُوْهُ -উহা দেয়া হয়েছিল। مِنْ م بَعْدِ - পরও। مَا - সাথে/যা। جَاءَتْهُم - তাদের নিকট আসলো। اَلْبَيِّنٰتِ - স্পষ্ট/উজ্জল নিদর্শন। بَغْيًام - বিদ্বেষবশত। بَيْنَهُم-তাদের মাঝে। فَهَدَى اللهُ - অতঃপর আল্লাহ পথ দেখালেন। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - যারা ঈমান এনেছিলো। لِمَا اخْتَلَفُوْا - যে বিষয়ে তারা মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো। فِيهِ - তাতে/উহাতে। مِنَ الْحَقِّ - সেই সত্য বিষয় সম্পর্কে। بِاِذْنِهٖ - তাঁর অনুমতিক্রমে। يَهْدِى - পথ দেখান। مَنْ يَّشَاءُ - যাকে ইচ্ছা করেন। اِلٰى - দিকে। صِرَاطٍ - পথ। مُسْتَقِيمٌ - সরল সঠিক। اَمْ حَسِبْتُم - তোমরা কি হিসাব/মনে করে নিয়েছো? اَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ - যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? وَلَمَّا - অথচ এখন পর্যন্ত। يَاتِكُمْ - তোমাদের কাছে/উপর আসেনি। مَثَلُ - আবস্থা/অনুরূপ। اَلَّذِيْنَ - যারা। خَلَوْا - অতীত হয়েছে। مِنْ قَبْلِكُم তোমাদের পূর্বে। مَسَّتْهُمْ - নেমে এসেছিলো তাদের উপর। اَلْبَأْسَاءُ - অর্থ সংকট। اَلضَّرَّاءُ - দুঃখ কষ্ট/বিপদ-মসিবত। وَزُلْزِلُوْا-এবং তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো। حَتّٰى -এমন কি। يَقُوْلَ -তারা বলে উঠেছিলো/আর্তনাদ করেছিলো। اَلرَّسُوْلَ - তদানীন্তন রাসূল। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - আর যারা ঈমান এনেছিলো। مَعَهٗ

তাঁদের সাথে । مَتٰى - কখন আসবে? نَصْرُ اللّٰهِ - আল্লাহর সাহায্য। اَلَا - হাঁ/যেন রেখো। اِنَّ - নিশ্চয়। نَصْرَ اللّٰهِ - আল্লাহর সাহায্য। قَرِيْبٌ - অতি নিকটে।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল কুরআনের সর্ববৃহত সূরা- সূরা আল বাকারার ২১৩ ও ২১৪ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ পাক যেন আমাকে হক আদায় করে তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাহবিল্লাহ।"

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার নাম 'সূরাতুল বাকারা'। بَكَرَةٌ - শব্দের অর্থ গাভী বা গরু। অত্র সূরার ৮ম রুকুর ৬৭-৭১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতি গরু জবেহ্ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে بَكَـــرَةٌ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই উল্লেখিত 'বাকারা' শব্দটিকেই বাছাই করে চিহ্ন বা প্রতীকী হিসেবে এই সূরার নাম "সূরাতুল বাকারা" নামকরণ করা হয়েছে। এই সূরার নামকরণ কোনো শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার অধিকাংশ আয়াত-ই হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এই সূরার কিছু আয়াত মাদানী জীবনের শেষের দিকে যেমন, সুদ হারাম সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই সূরার সাথে সম্পর্কিত করে দেয়া হয়। আবার কিছু আয়াত বিশেষ করে সূরার শেষের আয়াতগুলো হিজরাতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়েছিলো, কিন্তু বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এই সূরার সাথে সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। তবে সবকিছুই করা হয়েছে ওহীর নির্দেশের মাধ্যমে।

এই সূরার অধিকাংশ আয়াতই হিজরাতের পরে নাযিল হয়েছে বিধায় এই সূরাকে 'মাদানী' সূরা বলা হয়। এটি আল কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা। এতে ৪০টি রুকু এবং ২৮৬টি আয়াত রয়েছে।

www.pathagar.com

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ এই দীর্ঘতম সূরায় ইসলামের অধিকাংশ মূল নীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমেই মুত্তাকী, কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিফল ও পরিণামের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। আদম সৃষ্টি ও মানব জাতির দুনিয়ায় আগমনের ইতিকথাও আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বনি ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ এবং তাদের অকৃতজ্ঞার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মৌলিক ইবাদত- নামায, রোজা, জাকাত ও হজ্জ্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বানিজ্য, জিহাদ এবং যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং সূরার সবশেষে দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ কামনার জন্য মহান আল্লাহ পাক বান্দাহদের এক হৃদয়গ্রাহী মুনাজাত শিখিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াত দু'টির বিষয়বস্তু ঃ ২১৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রথম দিকে সকল মানুষই একই পথ-পন্থার অনুসারী ছিলো। কালক্রমে তারা বিভেদে জড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাদের বিভেদ দূর করার জন্য যুগে যুগে নবী পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন সত্য পথের অনুসারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং বিপথগামীদের জন্য জাহান্নামের ভয় দান কারী হিসেবে। সাথে সাথে তাদের মতোভেদ দূর করার জন্য আসমানী কিতাব দান করেছেন।

২১৪ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঈমানের দাবীদাররা মনে করে যে, তারা কোনো পরীক্ষা ছাড়াই এমনি এমনি বিনা বাধায় জান্নাতে চলে যাবে। অথচ অতীতের নবী-রাসূল এবং তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই পরীক্ষা এমন ছিলো যে, কঠিন যুলুম নির্যাতনে তারা জর্যরিত হয়ে আল্লাহর সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করে উঠেছিলো, আর আল্লাহও তাদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সূরার পটভূমি ঃ মাক্কী সূরাগুলোতে মহান আল্লাহ পাক মক্কার কাফির ও মুসলমানদেরকে সম্বোধন করেই বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নাযিল করেন। তার কারণ মক্কাতে এ দু'টি দলই ছিলো। মুসলমানরা মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহর রাসূল এবং আল কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে মানতো।

পক্ষান্তরে কাফিররা আল্লাহর রাসূলের বিরোধীতা করতো এবং আল কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করতো না। এ কারণেই এই দু'দলের উপলক্ষ্যেই কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হতো। কিন্তু মদীনায় হিজরাতের পর আরো দু'টি দল ইহুদী ও মুনাফিকদের মোকাবেলা করতে হলো। ইহুদীরা 'আহলি কিতাব' হওয়ার কারণে তারা নবী-রাসূল বিহিশত-দোযখ, কিয়ামত, আখিরাত ও আসমানী কিতাব- তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলে রাসূলের পরিচয় ও তাঁর উপর নাযিল হওয়া আল কুরআন আল্লাহ তা'লার নিজস্ব কালাম হওয়ার সত্যতা বর্ণিত হয়েছে, তা তারা জানতো। কিন্তু ইহুদীরা অহেতুক হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর সত্যতা সম্পর্কে জানা-শোনার পরও রাসূলের বিরোধীতা করতো। অপর পক্ষে মুনাফিকরা মুসলিম সমাজের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার লোভে মুখে নিজেকে মুসলিম হিসেবে জাহির করলেও ভিতরে ভিতরে তারা মুহাম্মদ (সঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতো। এমনকি তারা কিভাবে মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর দলকে ধ্বংস করা যায়, তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই কাজে লাগাতো। মাদানী এই সূরা আল বাকারা উপরোক্ত এই চার শ্রেণী লোকদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আল বাকারার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে ধারাবাহিকভাবে পেশ করছি। প্রথম আয়াতে সকল মানুষ একই দলভুক্ত ছিলো কিন্তু কালক্রমে তারা মতোভেদে জড়িয়ে পড়ে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا
بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط
وَاللهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

www.pathagar.com

প্রথমে তো সকল মানুষ একই পথের অনুসারী ছিলো (পরবর্তীতে তারা মতোভেদে জড়িয়ে পড়ে)। তখন আল্লাহ্ নবী পাঠালেন সত্য সন্ধানীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং বিপথগামীদের জন্য আযাবের ভয় দানকারী হিসেবে। তার সাথে নাযিল করলেন কিতাব, যাতে তাদের মধ্যে যে মতোবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো সে বিষয়ে তারা চূড়ান্ত ফায়সালা করতে পারে। আসলে কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতোভেদ করেনি, বরং পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেশ ও হঠকারিতার কারণে তারাই সেই সত্য সঠিক বিষয় নিয়ে মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ঈমানদারদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে যে ব্যাপারে তারা মতোবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

অর্থাৎ এই আয়াতে যা পাওয়া যায় তা হলো, কোনো এক সময় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের অনুসারী ছিলো। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করতো। কালক্রমে তাদের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। ফলে হক ও বাতিল তথা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই মহান আল্লাহ মেহেরবাণী করে সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্যে এবং সঠিক পথ বাতলিয়ে দেয়ার জন্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং সাথে সাথে তাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল করেন। নবী ও রাসূলগণের চেষ্টা ও দাওয়াতের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতবাদকে গ্রহণ করে নিয়ে মুমিন-মুসলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর একদল তা প্রত্যাখান করে নবী রাসূলগণকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে অবাধ্য ও অবিশ্বাসী হয়ে কাফির হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

أُمَّةٌ (উম্মাতুন) কাকে বলে? ঃ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً আয়াতে উল্লেখিত أُمَّةٌ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদুল কুরআনে' বলেছেন, আরবী অভিধান অনুযায়ী এমন মানব গোষ্ঠীকে أُمَّةٌ

www.pathagar.com

(উম্মত) বলা হয়, যাদের মধ্যে কোনো বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সেই ঐক্য, মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার কারণেই হোক কিংবা কোনো অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার মিলের কারণেই হোক। (মা'রিফুল কুরআন)

কোন্ বিষয়ে এক বা ঐক্যবদ্ধ ছিলো ?ঃ আয়াতে উল্লেখ আছে أُمَّةً وَّاحِدَةً "একই উম্মত বা দলভুক্ত ছিলো।" কোন্ বিষয়ে এক বা ঐক্যবদ্ধ ছিলো? এর উত্তর আয়াতের শেষের বাক্যটির দ্বারা পাওয়া যায়। এতে তাদের মধ্যে মতানৈক্য বা মতোভেদ সৃষ্টি হওয়া এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য সঠিক মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রাসূল পাঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে নবী-রাসূল প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় বা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে মতাদর্শ, আকীদা ও চিন্তা-চেতনার বিষয়ে মতোবিরোধ বা মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো। একাত্ববাদ বলতে আল্লাহর একাত্বকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এই বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিলো, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অনুসারী ছিলো। এখানে প্রশ্ন হলো তারা কি তাওহীদ ও ঈমানের দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো না মিথ্যা ও কুফরীর বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো? অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে তারা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের বিষয়ে ঐক্যমত বা ঐক্যবদ্ধ ছিলো।

তাওহীদ ও ঈমানের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার যুগ কোন্‌টি ?ঃ এখন জানা প্রয়োজন যে, সত্য দ্বীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষ কোন্ কালে বা যুগে ঐক্যবদ্ধ ছিলো ? এখানে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন-

প্রথম মত ঃ তাফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেছেনঃ এ বিষয়টি 'আ'লামে আযল' বা আত্মার জগতের বিষয়। কেননা, সমস্ত মানুষের রূহ বা আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো- أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের রব বা

www.pathagar.com

পালনকর্তা নই?" তখন তারা সকলেই এক ব্যাক্যে বলেছিলো- قَالُوْا بَلٰى (হ্যাঁ, নিশ্চয়।) অর্থাৎ তারা একই আকিদা ও বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলো, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়। (কুরতুবী)

দ্বিতীয় মত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এই একত্ববাদের বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আঃ) তাঁর স্ত্রী (হাওয়াকে) নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে লাগলো আর মানব বংস বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। তারা সবাই আদম (আঃ) এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিলো। একমাত্র কাবিল ছাড়া সবাই তাওহীদের অর্থাৎ একাত্ববাদের সমর্থক ছিলো। মুসনাদ-ই বায্যার গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একাত্ববাদের ধারণা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ইদ্রীস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। সে সময় সবাই মুসলমান ও একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো। এ উভয় নবীর (আদম থেকে ইদ্রীস আঃ পর্যন্ত) মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিলো দশ 'কর্ণ'। বাহ্যিকভাবে এক 'কর্ণ' দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। সুতরাং মোট সময়কাল ছিলো দশ শতাব্দী বা এক হাজার বছর।

তৃতীয় মত ঃ কোনো কোনো তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এই একই বিশ্বাসের যুগ ছিলো হযরত নূহ (আঃ) এর তুফান পর্যন্ত। নূহ (আঃ) এর সাথে যারা নৌকায় উঠেছিলো তারা ছাড়া সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিলো।

প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিলো, যে যুগগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

(মা'রিফুল কুরআন)

পরবর্তীতে কোন্ বিষয়ে মতোবিরোধ হলো ঃ উল্লেখিত আয়াতে কোন্ বিষয়ে মতোভেদ হলো তার কোনো উল্লেখ না করেই বলা হয়েছে-

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ " অতঃপর আল্লাহ তা'লা নবী পাঠালেন"।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত আদম (আঃ) এর মধ্যে দশটি যুগ ছিলো। ঐ যুগসমুহের লোকেরা

www.pathagar.com

সত্য শরীয়তের অনুসারী ছিলো, অতঃপর তাদের মধ্যে মতোভেদ সৃষ্টি হলো, তখন আল্লাহ তা'লা নবীগণকে প্রেরণ করেন। তার কিরাত হলো- وَمَاكَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا "অর্থাৎ মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলো, অতঃপর তারা মতোভেদ সৃষ্টি করে।"

(সূরা ইউনুস-১৯)

হযরত কাতাদাহ্ও তাফসীর এরকমই করেছেন যে, যখন তাদের মধ্যে মতোভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) কে প্রেরণ করেন। হযরত মুজাহীদও এটাই বলেন।

(ইবনে কাসীর)

যদিও এখানে এবং সূরা ইউনুসের ১৯ নং আয়াতে কোন্ বিষয়ে মতানৈক্য বা মতোভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তা উল্লেখ করা না হলেও উপরে উল্লেখিত তাফসীরে যে বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলো উল্লেখ করা হয়েছে, এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরবর্তীতে তাদের মধ্যে সেই বিষয়েই মতোভেদ বা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো।

মানুষের মধ্যে এসব মতানৈক্য মিমাংসার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো, সে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পরবর্তী ব্যাক্যে বলেন-

فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

অতঃপর আল্লাহ তা'লা নবী পাঠালেন (মুমিনদের জান্নাতের) সুসংবাদ এবং (কাফিরদের আযাবের) দুঃসংবাদ দানকারী হিসেবে।

অর্থাৎ যারা তাওহীদ ও ঈমানের বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার পরও প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দান করছেন এবং যারা মতানৈক্য সৃষ্টি করে আল্লাহর একত্ববাদের মধ্যে শিরক ঢুকিয়ে দিলো এবং ঈমানের বিষয়ে কুফরী করলো তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

অতঃপর তাদের মতানৈক্য মিমাংসার জন্য নবীদের কাছে কিতাব পাঠালেন উল্লেখ করে পরবর্তী ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন-

وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

এবং তিনি তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করলেন, যাতে করে ঐ কিতাব দ্বারা তাদের মধ্যে মতোভেদের বিষয়গুলো মিমাংসা করে দেন।
অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যেসব মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছিলো তা নিরসনকল্পে মহান আল্লাহ নবীদের উপর ওহী ও আসমানী কিতাব নাযিল করলেন যাতে করে বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দিতে পারেন।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

অথচ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতোভেদ করেনি, বরং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেশ ও হঠকারিতা বশতঃ তারাই সেই সত্য সঠিক বিষয় নিয়ে মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলো।

অর্থাৎ নবী রাসূল এবং আসমানী কিতাবের দ্বারা প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেল।
কিছু লোক এ হিদায়েতকে প্রত্যাখান করে কাফির হয়ে গেল। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, যাদের কাছে নবী-রাসূল এবং বস্তুনিষ্ঠ আসমানী কিতাব এসেছে তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ ইহুদী-নাসারাগণ যাদেরকে 'আহলি কিতাব' বলা হয়। এরা জেনে বুঝেও শুধুমাত্র গোড়াঁমী, হিংসা-বিদ্বেস ও জেদের বশবর্তী হয়ে তারা এসবের বিরোধিতা করেছে।

আর অপর দলটি আল্লাহর হিদায়েতকে মেনে নিলো। নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের বিষয়ে মতানৈক্য বা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি না করে বরং তারা প্রকৃত দ্বীন ইসলামের উপর টিকে থেকে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হিসেবে গণ্য হলো। অতঃপর পরবর্তী ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন-

فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ঈমানদারদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতোবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।"

অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মুমিনদের সুপথ দেখিয়ে দেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ। সুতরাং তারা মতোবিরোধের চক্র হতে বের হয়ে সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাদীসে উল্লেখ করেন, আমরা দুনিয়ায় আগমনকারী হিসেবে সর্বশেষ বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমরাই সর্বপ্রথম হবো। আহলি কিতাবকে (ইহুদী নাসারাদেরকে) আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং আমাদের দেয়া হয়েছে পরে। কিন্তু তারা তাতে মতোভেদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ আমাদেরকে সুপথ দেখান। জুমুয়া'র দিন সম্পর্কেও এদের মধ্যে মতোবিরোধ রয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই বিষয়ে সৌভাগ্য লাভ হয় যে, এই দিক দিয়েও সমস্ত আহলি কিতাব আমাদের পেছনে পড়ে যায়। 'শুক্রবার' আমাদের, 'শনিবার' ইহুদীদের এবং 'রবিবার' খৃষ্টানদের।

হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জুমু'য়া ছাড়াও কিবলার বিষয়েও এটা ঘটেছে। খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে কিবলা বানিয়েছে, আব ইহুদীরা কিবলা করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসকে, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারীরা কা'বাকে তাদের কিবলা নির্ধারণ করেছে।

নামাযের বিষয়েও মুসলমানরা আগে রয়েছে। আহলি কিতাবদের কারও নামাযে রুকু আছে কিন্তু সাজদাহ নেই, আবার কারও সাজদাহ আছে কিন্তু রুকু নেই। আবার কেউ কেউ নামাযে কথাবার্তা বলে থাকে, আবার কেউ কেউ নামাযে চলাফেরা করে থাকে। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতের নামায নীরবতা ও স্থীরতার সাথে পালিত হয়। এরা নামাযের মধ্যে না কথা বলবে, না চলাফেরা করবে। রোযার বিষয়েও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এতেও মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত সুপথ লাভ করেছে। পূর্বের উম্মতের লোকেরা কেউ কেউ তো দিনের কিছু অংশ রোযা রাখতো এবং কেউ কেউ কোনো কোনো প্রকারের খাদ্য ত্যাগ করতো। কিন্তু আমাদের রোযা সবদিক দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এর মধ্যে আমাদেরকে সত্য পথ সম্বন্ধে বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ইহুদীরা বলেছিলো যে, তিনি ইহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলেছিলো যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন পুরোপুরি মুসলিম ছিলেন। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা সুপথ লাভ করেছি এবং ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক ধারণাই দেয়া হয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) কেও ইহুদীরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো এবং তাঁর সম্মানিতা মা সম্পর্কে জঘণ্য মিথ্যা কথা বলেছিলো। আর খৃষ্টানরা তাঁকে আল্লাহ ও আল্লাহর পুত্র বলেছিলো। কিন্তু মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'লা এ দু'টো হতেই রক্ষা করেছেন। তারা তাঁকে আল্লাহর রূহ, আল্লাহর কালিমা এবং সত্য নবী বলে স্বীকার করেছে। (ইবনে কাসীর)

হযরত রাবী বিন আনাস (রাঃ) বলেন, আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, যেমনভাবে সমস্ত লোক আল্লাহর উপাসনাকারী ছিলো, তারা সৎকাজ করতো এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকতো। অতঃপর মাঝপথে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিলো। তেমনিভাবে শেষ উম্মতকে আল্লাহ তা'লা মতানৈক্য হতে সরিয়ে প্রথম দলের ন্যায় সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন। এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের উপর স্বাক্ষী হবে। এমনকি হযরত নূহ (আঃ) এর উম্মতের উপরেও এরা স্বাক্ষ্য দেবে। হযরত হুদ (আঃ) এর কওম, হযরত তালূত (আঃ) এর কওম, হযরত সালেহ (আঃ) এর কওম, হযরত শুয়া'ইব (আঃ) এর কওম এবং ফিরাউনের বংশধরদের মীমাংসাও এদের স্বাক্ষের মাধ্যমেই হবে। এরা বলবে যে, এই নবীগণ (আঃ) প্রচার করছিলেন আর এই উম্মতেরা তাঁদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। (ইবনে কাসীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে-

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন।

অর্থাৎ সঠিক পথ পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে সঠিক পথ পাওয়া আল্লাহর উপর নির্ভর করে। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। এই জন্য সঠিক পথ পাবার জন্য নিজে যেমন চেষ্টা করতে হবে তেমনি চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে।

www.pathagar.com

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যে উঠতেন তখন এই দোয়াটি পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَاءِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিলের রব! হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের জ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাহ্দের পারস্পারিক মতোভেদের মীমাংসা করে থাকো। আমার মুনাজাত এই যে, যেসব বিষয়ে মতোভেদ সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে যা সঠিক তুমি আমাকে তারই জ্ঞান দান করো। তুমি তো যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাকো।"

এছাড়াও নবী করীম (সঃ) আরও দোয়া পাঠ করে থাকতেন। যেমন-

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ الْحَقَّ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ وَلَا تَجْعَلْهُ مُتَلَبِّساً عَلَيْنَا فَنَضِلُّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"হে মহান আল্লাহ! যা সত্য তা আমাদেরকে সত্য হিসেবেই দেখাও এবং তা অনুসরণ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করো। আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবেই আমাদেরকে দেখাও এবং আমাদের তা হতে বাঁচবার তাওফীক দান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সামনে সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেখিও না, যার কারণে আমরা বিপথগামী হয়ে পড়ি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সৎ ও মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও। (ইবনে কাসীর) নবীর সঠিক-সত্য পথ পাবার জন্য এই পথ ধরেই আমাদেরকে চলতে হবে।

পূর্বোকালে তো আহলি কিতাবীরা দ্বীনের বিষয়ে মতানৈক্য করেছিলো। কিন্তু অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আল

কুরআন ও নবীর সহীহ্ হাদীস থাকার পরও নিজেরাই মতানৈক্যে-মতোভেদে জড়িয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। আর এই মতোভেদ সৃষ্টি করছেন আলেম শ্রেণীরাই। সুতরাং আমাদেরকে সঠিক এবং সত্য পথ পেতে হলে অথবা কোনো বিষয়ে সত্য তালাশ করতে হলে আল কুরআন এবং সহীহ্ হাদীস থেকেই তালাশ করতে হবে। আর যদি এ দু'টি থেকে আমরা সত্য-সঠিক বিষয় সন্ধান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা গোমরাহীর পথে ধাবিত হবো। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে তাঁর উম্মতের সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেছেন-

اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ

"আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। তার একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর নবীর সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার পবিত্র কালাম আল কুরআন এবং নবীর সহীহ্ হাদীস থেকেই সঠিক বিষয় তালাশ করার তাওফীক দান করো। আমীন।

অতঃপর জান্নাত পাবার সঠিক পথ বাতলিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেন-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللهِ ط اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে। অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আসে নাই। তাদের উপর এসেছে বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসীবত, তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে। এমনকি তৎকালীন রাসূল এবং তাঁদের সংগী-সাথীরা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে ? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

উপরের আয়াত এবং এই আয়াতের মাঝখানে এক লম্বা ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ না করার কারণ হলো, শেষের আয়াত-ই সেই দিকে পরিস্কার ভাবে ইংগিত করেছে এবং আল কুরআনের মাক্কী সূরা সমূহে যা সূরা বাকারার পূর্বে নাযিল হয়েছিলো সেসব সূরাগুলোতে এই মহা পরীক্ষার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেকের ধারণা বা আশা যে, দুনিয়ার পরীক্ষা ছাড়াই সে বাধাহীন সহজ সহজ আ'মল করে জান্নাতে চলে যাবে। এ শ্রেণীর লোক আগেও ছিলো, এখনও আছে, হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আয়াতের ভাবার্থে বুঝা যায় যে, পরীক্ষার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের আশা করা ঠিক নয়। আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, যুগে যুগে যতো নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের সকলকেই এবং তাঁদের অনুসারী সঙ্গী-সাথীদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁদেরকে যেমন একদিকে দুনিয়ার বালা-মসিবত, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ইত্যাদি দিয়ে শারিরীক, মানসিক ও আর্থিক পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তেমনি সমসাময়িক শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। আল্লাহদ্রোহী ও অহংকারী লোকদের সহিত জান-প্রাণ দিয়ে মোকাবিলা করতে হয়েছিলো। তাঁদেরকে শত্রুর ভয় ও আতংকে আতংকিত করে তুলেছিলো। তারপরও তাঁরা সকল ধরনের ও প্রকারের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সফলতা লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁরা এই কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা মোকাবেলা করেই জান্নাত লাভ করেছিলেন।

পরীক্ষা ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না, তাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঈমানের দাবীদারদের সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করা। এই সম্পর্কে সূরা আনকাবুতের ২ ও ৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

www.pathagar.com

"মানুষেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। আর আল্লাহ অবশ্যই (পরীক্ষার মাধ্যমে) জেনে নিবেন কারা কারা ঈমানের এই দাবীতে সত্যবাদী এবং কারা কারা মিথ্যাবাদী।"

অতীতের নবী রাসূলদের পরীক্ষার ধরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সঃ) বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, যা সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী করীম (সঃ) এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চান না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? তখন তিনি সোজা হয়ে বসে বললেনঃ তোমাদের উপর এমন কি দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন এসেছে। তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাঁদের কারো জন্যে তো গর্ত খোড়া হতো এবং সেই গর্তের মধ্যে তাঁর দেহের অর্ধেক পুতে তাঁকে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর করাত দিয়ে চিরে তাঁকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এই অমানুষিক নির্যাতন তাঁকে তার দ্বীন থেকে দূরে সরাতে পারেনি। আবার কারো কারো শরীর থেকে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হতো। কিন্তু এতেও তাঁকে তার দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি। আল্লাহর কসম! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে (অর্থাৎ বিজয় লাভ করবে।) তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি 'সানআ' থেকে 'হাযরামাউত' পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে পাড়ি দেবে। আর এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। এবং (মালিক তার) মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে (বাঘ) ছাড়া আর অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু আফসোস! তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছো।

পরীখার (খন্দকের) যুদ্ধেও সাহাবায়ে কিরামদেরও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো। পবিত্র কুরআনেই এই চিত্র আঁকা হয়েছে।

www.pathagar.com

اِذْجَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَوَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِىَ
الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ
وَالَّذِيْنَ فِىْقُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَااللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّاغُرُوْرًا ۝

"বলা হচ্ছে, যখন তারা (কাফিররা) তোমাদের উপরের দিক হতে ও নীচের দিক হতেও তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিলো এবং যখন (ভয়ে-বিস্ময়ে) তোমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিলো ও তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিলো। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা পোষণ করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং ভীষণভাবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। তখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যধি ছিলো তারা বলেছিলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আমাদের দেয়া ওয়াদা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আহযাব ১০-১২)

পরীক্ষার পরেই বিজয় আসে। এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারীর 'কিতাবুল ওহী' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। খৃষ্টান বাদশাহ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কে তাঁর কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নবুওয়াতের দাবীদার মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে আপনাদের কোনো যুদ্ধ হয়েছিলো কি? আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, 'হাঁ'। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিলো? তিনি বলেছিলেন, কখনও আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনও তিনি। হিরাক্লিয়াস বলেন, এভাবেই নবীদের (আঃ) পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে।

সুতরাং যুগে যুগে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী উম্মতদের এভাবেই জান-মালের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাত যেতে হবে। সহজ সহজ আ'মল করে, তাগুতীশক্তির সাথে আপোশ করে, বাধাহীনভাবে চোরাগোপ্তা কোনো পথে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এভাবে এই পথে মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান আল্লাহর নিয়ম নয়। অথচ আমাদের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ লোক এ পথেই জান্নাতে যাবার চেষ্টায় নিয়োজিত আছে।

www.pathagar.com

চূড়ান্ত পরীক্ষার পরই আল্লাহর সাহায্য আসে ঃ আয়াতের সর্বশেষ ব্যাক্যে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلا اِنَّ نَصرُ اللهِ قَرِيبٌ জেনে রেখো! আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

অর্থাৎ আয়াতের এই শেষাংশে বলা হচ্ছে, যুগে যুগে যখন নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী সঙ্গী-সাথীদের পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন তাঁরা যুলুম-নির্যাতনে জর্যরিত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। এ কথা বলার দ্বারা এই নয় যে, নবীরা বুঝি আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারে সন্ধিহান ছিলেন! না, তাঁরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তাঁদের এ প্রশ্নের বা আকুতির উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যদিও আল্লাহ তা'লা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, কিন্তু এর সময় ও স্থান ঠিক করে দেননি। সুতরাং তাঁদের এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের আকুতির অর্থ ছিলো এই যে, আল্লাহর সাহায্য তাড়াতাড়ি নাযিল হোক। এটা নবীদের শানের পরিপন্থী নয়। বরং মহান আল্লাহ বান্দাহ্দের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। আর নবী রাসূলগণই এ ধরনের প্রার্থনার বেশী উপযুক্ত। আর নবীগণই সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন বলা হয়েছে-

قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ اَشَدُّ النَّاسَ بِلاَءً اَلاَ نْبَيَـــاءِ ثُمَّ الاَمْثَلُ فَالاَ مْثَلُ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ সবচেয়ে কঠিন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ। সুতরাং আল্লাহ অত্যাচার নির্যাতনে জর্যরিত নবী-রাসূল এবং মুমিনদেরকে আশ্বসত ঃ করে বলছেন, তোমরা অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ো না, আরো একটু ধৈর্যধারণ করো-আল্লাহর সাহায্য তো তোমাদের দোর গোড়ায়।

অতএব যুগে যুগে মুমিনদেরকে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শক্তি, খোদাদ্রোহী তাগুতি শক্তি এবং নাস্তিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুলম-নির্যাতন চালাবে। মিথ্যাচার করে চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করবে। শারিরীক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন করবে। সেই ক্ষেত্রে জান্নাত পাবার লোভে এসবকে

www.pathagar.com

তুচ্ছ মনে করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং দ্বীনের বিজয় হবে। আল্লাহর সাহায্যতো তখনই আসবে, যখন বান্দাহর সমস্ত চেষ্টা শেষ হয়ে যাবে। চেষ্টা না করেই এমনি এমনি দোয়া করলে কোনো কাজে আসবে না।

সূরা মুহাম্মদের ৩১ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

"আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী (আন্দোলন-সংগ্রামকারী) এবং কে কে সবরকারী। আর যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।"

শিক্ষাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পবিত্র আল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ সূরা-সূরা আল বাকারার ২১৩ ও ২১৪ নম্বর দু'টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলো। এখন জানতে হবে যে, এ দু'টি আয়াতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে ? নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

১. মানুষের প্রকৃতির ধর্ম বা আদি ধর্ম হলো ইসলাম, আয়াত দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়। আর ইসলামের মূল ভিত্তিই হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা তাওহীদ ও ঈমান নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমাদের তাওহীদের বিষয়ে কোনো আপোষ করা যাবে না। অথচ আমরা মুখে বলে থাকি যে, আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করি, কিন্তু বাস্তব জীবনে আ'মল করতে গিয়ে জেনে হোক আর না জেনে হোক, বুঝে হোক আর না বুঝে হোক, ছোট হোক আর বড় হোক, বিভিন্নভাবে অনেকেই শিরকে জড়িয়ে পড়ি। অথচ যতো রকম বা ধরনের গোনাহ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং আল্লাহর নিকট অমার্জনীয় গোনাহ হলো শিরক। এজন্য আমাদেরকে শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হতে হবে এবং এ বিষয়ে কোনো মতানৈক্য সৃষ্টি করা যাবে না। আর যুক্তি দিতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ শিরকে জড়িতও হওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

২. যুগে যুগে যতো নবী-রাসূল এসেছেন, সকলেই সমসাময়িক মানুষের জন্য সত্য-সঠিক পথ দেখানোর জন্যই এসেছেন এবং তাঁরা সত্য সন্ধানী ও অনুসারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে সত্য-সঠিক বিষয়কে প্রত্যাখানকারীদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ পৌছিয়ে দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনিই বিশ্ব জাহানের নবী ও সর্বশেষ নবী। আর আল কুরআন হলো সর্বশেষ পরিপূর্ণ আসমানী কিতাব। এরপরে আর কোনো নবী ও কিতাব আসবে না এবং আসারও প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে অথবা মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তার সমাধান আল কুরআন এবং নবীজীর সহীহ হাদীস দ্বারাই সমাধান করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাধারণ মানুষ নয়, বরং আলিম শ্রেণীর লোকেরাই মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ছে। আর এই মতোভেদ বা মতানৈক্যের সমাধানের জন্য আল কুরআন এবং সহীহ হাদীসের সন্ধান না করে বিভিন্ন ব্যক্তির কথা বা ফতুয়াকে অবলম্বন করে আরো বেশী বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সমাজের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এবং সত্য ও সঠিক বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে গোমরাহীর কাজে সাহায্য করছেন।

৩. আল কুরআন নাযিলের পর যারা এই কিতাব এবং রাসূল (সঃ) সম্পর্কে বিতর্ক বা মতানৈক্য করেছিলো তারা ছিলো 'আহলি কিতাব' তথা কিতাবধারী ইহুদী ও নাসারা। তারা যে বিতর্ক এবং মতোভেদ সৃষ্টি করেছিলো তা ছিলো তাদের গোঁড়ামী, হিংসা-বিদ্বেশ এবং হঠকারিতার কারণে। সুতরাং আমরা যারা মুসলিম নামধারী আছি, এখন যদি আমরাই আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাহ নিয়ে বিতর্ক, বিভেদ ও সন্দেহ সৃষ্টি করি তাহলে তো ইহুদী খৃষ্টান থেকে আমাদের কোনো পার্থক্যই থাকে না। অথচ দেখা যায়, অনেক আলিম শ্রেণীর লোকেরাই বিদ্বেস বশত ঃ এবং গোড়ামীর কারণে কুরআন ও সহীহ হাদীসকে কটাক্ষ করে বসেন। অতএব তাওহীদবাদী খাঁটি মুমিনদের অবশ্যই আল কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বিষয়ে মতোভেদ সৃষ্টি করা হতে দূরে থাকতে হবে।

৪. সত্য-সঠিক পথের হিদায়াত পাওয়া আল্লাহর মর্জি ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং সত্য-সঠিক সন্ধান পাওয়ার জন্য যেমন আল কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে তালাশ করতে হবে, তেমনি সত্য সঠিক পথ পাওয়ার জন্য

আল্লাহর কাছেও সাহায্য কামনা করতে হবে। যেভাবে নবীজী তাহাজ্জুদ নামাযে উঠার সময় কামনা করেছিলেন, যা পূর্বে ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. জান-মালের পরীক্ষা ছাড়া কোনো মুমিনই যেনতেন ভাবে চোরাগোপ্তা পথে জান্নাত পাবার আশা পোষণ করতে পারে না। বরং দুনিয়ার জীবনে যুলুম-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, জান-মালের ক্ষতি এবং মানসিক কষ্ট ইত্যাদির চূড়ান্ত পরীক্ষার পরই বান্দাহ্র কাঙ্খিত জান্নাত পাওয়া যাবে এটাই সদাসর্বদা মনে রাখতে হবে।

৬. আল্লাহ মুমিন কেন, যুগে যুগে সকল নবী রাসূলগণকেই কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-মুসিবত এবং তৎকালীন তাগুতী শক্তির চরম বাধা ও নির্যাতনের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন। আর নবী রাসূলগণকে তো সাধারণ মুমিন থেকে বেশী এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা করা হয়েছে।

৭. প্রতিটি মুমিন-মুমিনাকে জান্নাত পাবার জন্য যে কোনো পরীক্ষার সম্মুক্ষীন হওয়ার প্রস্তুত থাকতে হবে। আর যখন পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে তখন তা থেকে উদ্ধারের জন্য দু'টি পথ অবলম্বন করতে হবে। একটি হলো-সবর বা চরম ধৈর্য, আর অপরটি হলো- আল্লাহর সাহায্য।

৮. তাগুতিশক্তি বা যুলুমবাজ সরকারের চরম যুলুম-নির্যাতন এবং বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা মোকাবেলা চরম ধৈর্যের দ্বারাই করতে হবে। অধৈর্য-অসহিঞ্চু হলে চলবে না এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে দেরী দেখে পালিয়েও যাওয়া যাবে না বা গা ঢাকা দেয়া যাবে না কিম্বা আপোশ করাও যাবে না এবং অধৈর্য হয়ে আল্লাহ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা খারাপ ধারণা পোষণ করাও যাবে না। এতে আল্লাহর সাহায্য বন্ধ হয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আহবান ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! সূরা আল বাকারার ২১৩ ও ২১৪ নম্বর আয়াত দু'টির দারস দিতে গিয়ে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যাই, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এ দু'টি আয়াত থেকে আমরা যেসব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি মহান আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

www.pathagar.com

সাত

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্য নবী হওয়া, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহী তথা আল কুরআনে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না থাকা এবং নবী করীমের (সঃ) জিবরাঈল কে আসল রূপে স্বচক্ষে দেখা প্রসঙ্গে।

সূরা-আন্ নাজম -৫৩
আয়াত -১-১৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ○ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ○
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ○
عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ○ ذُوْ مِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى ○ وَهُوَ
بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ○ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ○ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ
اَوْ اَدْنٰى ○ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ○ مَا كَذَبَ
الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ○ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ○ وَلَقَدْ رَاٰهُ
نَزْلَةً اُخْرٰى ○ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে-(১) শপথ তারকার, যখন ওটা ডুবে যায়। (২) তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ সঃ) বিভ্রান্ত হননি এবং বিপথগামিও হননি। (৩) তিনি নিজের মনগড়া কথাও বলেন না। (৪) এটা তো একটা ওহী,

www.pathagar.com

যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। (৫) তাঁকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফিরিশতা, (৬) যে বড় কৌশলী। সে নিজ আকৃতিতে সামনে এসে দাঁড়ালো, (৭) যখন সে উর্দ্ধ দিগন্তে অবস্থিত ছিলো। (৮) অতঃপর সে নিকটে আসলো এবং উপরে ঝুলে থাকলো। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিলো অথবা আরও কম। (১০) তখন সে আল্লাহর বান্দাহকে ওহী পৌছালো, যে ওহী-ই তাঁকে পৌছানোর ছিলো। (১১) রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা তিনি দেখেছেন। (১২) এখন কি তোমরা সেই বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা তিনি নিজ চোখে দেখেছেন? (১৩) নিশ্চয় তিনি তাকে আর একবার দেখেছেন, (১৪) 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকট, (১৫) যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা-ওয়া।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَالنَّجْمِ - তারকার কসম/নক্ষত্রের শপথ। اِذَا - যখন। هَوٰى - অস্তমিত হয়/ডুবে যায়। مَاضَلَّ - গোমরাহ/পথভ্রষ্ট হননি। صَاحِبُكُمْ - তোমাদের সঙ্গী। مَاغَوٰى - বিপথগামী হননি। وَ - এবং। مَايَنْطِقُ - কথা বলেন না। عَنِ الْهَوٰى - প্রবৃত্তি থেকে/প্রবৃত্তির তাড়নায়। اِنْ -নয়/যদি। هُوَ - উহা/তা। اِلَّا - এছাড়া/ব্যতিরেকে। وَحْىٌ - ওহী/প্রত্যাদেশ। يُوْحٰى - যা প্রত্যাদেশ হয়/নাযিল হয়। عَلَّمَهٗ - তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে। شَدِيْدُالْقُوٰى -প্রবল শক্তিশালী (ফিরিশতা)। ذُوْمِرَّةٍ - প্রজ্ঞাসম্পন্ন/মহা কৌশলী। فَاسْتَوٰى - অতঃপর সে স্থির হয়ে (দাঁড়িয়ে) ছিল। وَهُوَ - এবং সে। بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى - উর্দ্ধ দিগন্ত/উচ্চতর দিগন্ত। ثُمَّ - এরপর। دَنَا - সে নিকটবর্তী হলো/নিকটে আসলো। فَتَدَلّٰى - অতঃপর উপরে ঝুলে থাকলো। فَكَانَ -অতঃপর সে ছিলো। قَابَ - ব্যবধান/দূরত্বে। قَوْسَيْنِ - দুই ধনুকের। اَوْ - অথবা। اَدْنٰى - (তারও) কিছু কম। فَاَوْحٰى - অতঃপর ওহী পৌছালো/প্রত্যাদেশ করলো। اِلٰى -

www.pathagar.com

দিকে/নিকট। عَبْدِهٖ - তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহর। مَا - যা। اَوحٰى - ওহী পৌঁছানো বা প্রত্যাদেশ করার ছিলো। مَاكَذَبَ - মিথ্যা বলেনি। اَلْفُؤَادُ - দিল/অন্তর। مَارَاٰى - যা সে দেখেছে। اَفَتُمٰرُوْنَهٗ - তোমরা কি সেই বিষয়ে বিতর্ক করবে। عَلٰى - উপর। مَايَرٰى - যা সে দেখেছে। وَلَقَدْ - এবং অবশ্যই। رَاٰهُ -তাকে সে দেখেছিলো। نَزْلَةً-অবতরণ হতে। اُخْرٰى আরেকবার/দ্বিতীয়বার। عِنْدَ -নিকট। سِدْرَةِ -বদবৃক্ষ/কূলগাছ। اَلْمُنْتَهٰى - শেষ প্রান্ত। عِنْدَهَا - উহার নিকট/যার নিকট। جَنَّةُ - ঘনপাতা বিশিষ্ট বাগান। اَلْمَاْوٰى - ঠিকানা/বসবাসের স্থান/বিশ্রামস্থল।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত দ্বীনদার ভইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আন্ নাযম এর ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত মোট ১৫টি আয়াত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার শুরুতে উল্লেখিত وَالنَّجْمِ শব্দ থেকেই এই সূরার নাম 'আন্-নাযম' রাখা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা য়ায় যে, এই সূরার নাম কোনো শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। বরং পরিচিতি বা আলামত হিসেবেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ঃ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মাক্কী। সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থ সমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাজদাহ বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো এই 'আন্ নাজম' সূরা।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতেও এই হাদীসের যেসব অংশ ও টুকরা আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ, আবু ইসহাক ও জুহাইর ইবনে মুয়াবিয়ার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- তা থেকে জানা যায় যে, এটা কুরআন মজীদের এমন একটি সূরা যা নবী করীম (সঃ) কুরাইশদের এক সাধারণ সভায় (ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনানুযায়ী হেরেম শরীফে) সর্বপ্রথম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সভায় কাফির ও মুমিন উভয় শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিলো। শেষের দিকে তিনি যখন সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদাহ্ করলেন, তখন উপস্থিত (মুমিন কাফির) সমস্ত লোকই তাঁর সাথে সাথে সাজদাহ্ করলো। শুধু কাফিরদের একটি লোক যে সাজদাহ্ করার পরিবর্তে একমুষ্টি মাটি নিয়ে কপালে লাগিয়ে নিলো এবং বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি দেখি যে, এরপর ঐ লোকটি কুফরীর অবস্থাতেই মারা যায়। ঐ লোকটি ছিলো উমাইয়া ইবনে খাল্ফ। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, ঐ লোকটি ছিলো 'উৎবা ইবনে রাবীয়া'

(ইবনে কাসীর, মা'রিফুল কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআন)

সূরাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মাক্কী জীবনের নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ হয়। প্রমাণ হিসেবে ইবনে সায়া'দ বলেন, ইতোপূর্বে নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবায়ে কিরামদের একটি ছোট্র দল আবিসিনীয়ায় হিজরাত করেছিলো। এই বছরেই নবী করীম (সঃ) কুরাইশদের সভায় সূরা আন্ নাজম পাঠ করলেন এবং মুমিন ও কাফির সকলেই তাঁর সাথে সাজদায় পড়ে গেলো। এতে আবিসিনীয়ায় হিজরাতকারীদের নিকট ভিন্নভাবে খবর পৌঁছলো যে, মক্কায় কাফির লোকেরা সব মুসলমান হয়ে গেছে। এরূপ খবর পেয়ে আবিসিনীয়ায় হিজরাতকারী লোকদের মধ্য হতে কিছু লোক নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে মক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু তাঁরা এখানে ফিরে এসে দেখলেন যে, যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা কোনো পরিবর্তন হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পুনরায় হিজরাত করে আবিসিনীয়ায় চলে গেলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, এই সূরাটি নবুয়াতের পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলো। (তাফহীমুল কুরআন)

সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়েছিলো তা উপরোক্ত নাযিলের সময়কালে আলোচনায় জানা যায় যে,

www.pathagar.com

নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে তা নাযিল হয়েছিলো। নবুওয়াতের এই পাঁচটি বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে টার্গেট ভিত্তিক যোগাযোগ এবং গোপন বৈঠকে-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল কুরআনের বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে কাফির-মুশরিকদের কঠিন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকাশ্যে কোনো সাধারণ জনসমাবেশে আল কুরআনের বাণী পাঠ করে শুনানোর কোনো সুযোগই তাঁর হয়ে উঠেনি। মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যক্তিত্ব, দাওয়াতী কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতার আকর্ষণ এবং আল কুরআনের আয়াতসমূহের কি যে মারাত্মক প্রভাব ছিলো তারা সেই বিষয়ে পুরোপুরিভাবে অবহিত ছিলো। এজন্য তারা নিজেরাও যেমন এই অমিও বাণী শুনতে চাইতো না, তেমনি অন্যরাও যেন শুনতে না পায় সেইজন্য তাদের চেষ্টা যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলো না। রাসূলে করীম (সঃ) এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের ভুল ধারণা এবং মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা তারা দ্বীনী আন্দোলনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিলো। এই উদ্দেশ্যে তারা যেমন বিভিন্ন জায়গায় এই বলে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছিলো যে, মুহাম্মদ যেমন নিজে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তেমনি অন্য লোকদেরকেও বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার অপর দিকে তিনি যেখানেই পবিত্র আল কুরআনের বাণী শুনানোর চেষ্টা করতেন, সেখানেই তারা হট্টগোল, চিৎকার, হইহুল্লোড় করা তাদের একটা স্থায়ী বদ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এরূপ আচরণ করার মূল উদ্দেশ্যই ছিলো, তাঁকে কি কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে লোকেরা যেন তা জানতেই না পারে। এরূপ অবস্থায় একদিন মুহাম্মদ (সঃ) হেরেম শরীফের মধ্যে কুরাইশ বংশের এক সমাবেশে যেখানে কাফির-মুমিন উভয় লোকই ছিলো, সেখানে ভাষণ দেয়ার জন্য আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে যান। এই সময় আল্লাহ তা'লা রাসূলে করীম (সঃ) এর মুখ দিয়ে যে ভাষণটি বের করে দিয়েছিলেন, তাই আমাদের সামনে রয়েছে সূরা 'আন্-নাজম' রূপে। এই কালামের প্রভাব এতো তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিলো যে, তিনি যখন এটা শুনাতে শুরু করলেন, তখন ওর বিরুদ্ধে তাদের পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী কোনো চিৎকার বা হট্টগোল করার হুঁশ-ই তাদের ছিলো না। ভাষণ শেষ করে নবী করীম (সঃ) যখন সাজদায় পড়ে গেলেন, তখন তারাও সাজদায়

www.pathagar.com

পড়ে গেল। এটা ছিলো তাদের একটা বড় দুর্বলতা। তাদের এই দুর্বলতা যখন তাদের কাছে ধরা পড়ে গেল তখন নেতারা যেমন বিব্রত হয়ে পড়লো, তেমনি সাধারণ লোকেরাও তাদেরকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করতে লাগলো এই বলে যে, যে কালাম শুনতে তারা অন্যদেরকে নিষেধ করে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেরাই সেই কালাম শুধু যে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে তাই নয় বরং মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে তারাও সাজদাহ্ করেছে। সাধারণ লোকদের এই ভর্ৎসনা হতে বাঁচার জন্য তারা একটা মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দিলো। তারা বললোঃ দেখো, আমরা তো মুহাম্মদ (সঃ) এর মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম যে - أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى পড়ার পর যেন পড়ছেন - تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترتجى "এই উচ্চ সম্মানিত দেবী! আর তাদের শাফায়াত পাওয়ার খুবই আশা করা যায়" এই কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে, মুহাম্মদ আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে। এই কারণেই তাঁর সংগে সাজদাহ্ করতে আমরা কোনো দোষ মনে করিনি।

অথচ তারা যে বাক্য কয়টি শুনতে পেয়েছে বলে দাবী করছে, এই গোটা সূরার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে এবং তাতে এই বাক্য কয়টি পড়া হয়ে থাকতে পারে, এমন কথা কেবলমাত্র পাগলরাই চিন্তা করতে পারে। আসলে আল কুরআনের অমীয় বাণী সূরা আন্ নাজমের প্রভাবেই তারা তাদের মিথ্যা কথা বেমা'লুম ভুলে গিয়েই রাসূলের সাথে সাথে সাজদায় লুটিয়ে পড়েছিলো।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরা 'আন্ নাজম' এর এক কথায় বিষযবস্তু হলো- 'রিসালাত'। বিস্তারিত ভাবে বলা যায় যে, মক্কায় কুরাইশ কাফিররা পবিত্র আল কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে যে আচরণ করছে তা যে একান্তই ভুল সেই কথা জানিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক করে দেয়াই এই ভাষণটির মূল বিষয়বস্তু।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ঃ নবী, ফিরিশতা ও ওহী বা কিতাব এই তিন এর সমম্বয়ে হয় 'রিসালাত'। মহান আল্লাহ তা'লা কুরাইশদের মাধ্যমে গোটা দুনিয়াবাসীকে খবর দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ (সঃ)

www.pathagar.com

যে রাসূল, সুতরাং তাঁর স্বভাব চরিত্র ও বৈশিষ্ট কেমন হওয়া উচিত তা তুলে ধরা হয়েছে। আর যে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে রাসূল বানানো হয়েছে, সে ওহীও নির্ভেজাল এবং এটা মুহাম্মদের কোনো নিজস্ব মনগড়া কথা নয়, তাও তুলে ধরা হয়েছে এবং ওহী বাহক জিবরাঈল (আঃ) এর আসলরূপ ও প্রকৃতিও তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নাজম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য ব্যাখ্যার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

মহান আল্লাহ পাক সূরার শুরুতে পরবর্তী বক্তব্যের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আয়াতের প্রথমেই তাঁর সৃষ্টির কসম খেয়ে বলেন-

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى **শপথ তারকার, যখন ওটা অস্তমিত হয় বা ডুবে যায়।**

এখানে শুরুতেই যে 'وَ' (ওয়াও) ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে আরবী ব্যাকারণের পরিভাষায় "ওয়াও-এ-কাসমিয়া" বলা হয়। অর্থাৎ কোনো সূরার শুরুতেই যখন 'وَ' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়, তখন শপথ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অথচ 'وَ' এর আভিধানিক অর্থ হলো- এবং/ও/আর।

اَلنَّجْمُ - এই نَجْمُ শব্দটির অর্থ মুফাস্সীরগণ বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস, মুহাম্মদ ও সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, এর অর্থ 'কৃত্তিকা সপ্তনক্ষত্র' বা 'সুরাইয়া'। ইবনে জরীর ও জামাখশারী এই অর্থকেই বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, আরবী ভাষায় যখন শুধু اَلنَّجْمُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন সাধারণত ঃ এর অর্থ হয় কৃত্তিকা সপ্তনক্ষত্র সমষ্টি।

সুদ্দী বলেন, এর অর্থ 'শুক্রগ্রহ' বা 'জুহরা তারা'। আরবী ব্যাকারণ বিশারদ আবু ওবাইদাহ বলেন, এখানে اَلنَّجْمُ শব্দটি বলে নক্ষত্র পুঞ্জ

www.pathagar.com

বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো, যখন সকাল হলো ও নক্ষত্রপুঞ্জ অস্তমিত হয়ে গেল। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) বলেন, স্থান ও ক্ষেত্রের দৃষ্টিতে আমরা এই শেষ অর্থকেই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করি। (তাফহীমূল কুরআন)

هَوٰى - শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া/ডুবে যাওয়া। ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন। হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন যে, 'সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি বস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটার-ই নামে কসম খেতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো কসম খেতে পারে না।' (ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম খেতে বা শপথ করতে পারে না।

পবিত্র আল কুরআনের অসংখ্য সূরার প্রথমেই মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির এবং সময়ের ইত্যাদির কসম বা শপথ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন। এসবের কসম বা শপথ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি বুঝি ঐ জিনিস বা বস্তুটির গুরুত্ব বুঝাচ্ছেন। আসলে তা নয়, বরং পরবর্তীতে তিনি যে বক্তব্য বা বিষয়টি মানুষের কাছে তুলে ধরতে চান তার গুরুত্ব বুঝানো এবং মানুষের দৃষ্টিকে সেই দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই তিনি বিভিন্ন সৃষ্টির এবং সময়ের কসম খেয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন।

(আল্লাহই ভালো জানেন)

পরবর্তী আয়াতগুলোতে রিসালাতের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন-

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى **তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত হননি এবং বিপথগামীও হননি।**

এখানে 'তোমাদের সঙ্গী' বলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে বুঝানো হয়েছে।

صَاحِبُ শব্দটি আরবী ভাষায় বন্ধু, সঙ্গী, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং একসাথে উঠাবসা করে এমন লোককে বুঝায়।

নবী বা রাসূল কিংবা মুহাম্মদ বলার পরিবর্তে সঙ্গী বলার তাৎপর্য ঃ এখানে নবী করীম (সঃ) এর নাম বলা হয়নি, কিম্বা তোমাদের রাসূল এ কথাটিও বলা হয়নি। এর পরিবর্তে 'তোমাদের সঙ্গী' বলে নবী করীম (সঃ) কে

www.pathagar.com

বুঝানোর পেছনে গভীর রহস্য ও তাৎপর্য লুক্কায়িত রয়েছে। একথা বলে মূলতঃ কুরাইশ বংশের লোকদেরকে এই অনুভূতি দিতে চাওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) বাইরে থেকে আসা কোনো অপরিচিত মুসাফির বা প্রবাসী ব্যক্তি নন, যার কারণে তাঁর সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দেহ পোষণ করবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী-সাথী। সে তো তোমাদেরই সাথে বসবাসকারী জাতির লোক। তোমাদের দেশেই তাঁর জন্ম। এখনেই তিনি শৈশবকাল পার করে যৌবনে পৌঁছেছেন। তোমাদের কাছে তাঁর জীবনের কোনো কিছুই গোপন নয়। তাঁর স্বভাব চরিত্র, আচার-আচরণ, কায়-কারবার, আদত-অভ্যাস সব কিছুই তোমাদের সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জানা আছে। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছো যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাকে শৈশব কাল থেকে কোনো সময়ই কোনো মন্দ বা বাজে কাজে জড়িত হতে কিম্বা ধারে কাছেও যেতে দেখোনি। তাঁর চরিত্র, স্বভাব, সততা ও বিশ্বাস্ততার প্রতি তোমাদের এতোটুকু আস্থা ছিলো যে, গোটা আরববাসী তাঁকে 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী খেতাবে ভূষিত করে। এখন তিনি নবুওয়াতের দাবী করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করে দিয়েছো!

ضَلَّ অর্থ- 'বিভ্রান্ত হওয়া'। অর্থাৎ পথ না জানার কারণে কোনো ভুল পথে চলে যাওয়া। আর غَوٰى শব্দের অর্থ- 'পথভ্রষ্ট'। অর্থাৎ জেনে বুঝে ও ইচ্ছা করে ভুল পথ অবলম্বন করা।

নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারকারাজির কসম খেয়ে মহান আল্লাহর একথা বলার তাৎপর্য হলো এই যে, মুহাম্মদ (সঃ) তো তোমাদের অতি পরিচিত ব্যক্তি। তিনি পথভ্রষ্ট বা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন তোমাদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে না তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন, না বিভ্রান্ত হয়েছেন।

নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারকারাজির শপথ করার তাৎপর্য ঃ আয়াতের প্রথমেই তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ (সঃ) না পথভ্রষ্ট হয়েছেন, আর না বিভ্রান্ত হয়েছেন, এ কথাটি বলার জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারকারাজির শপথ করার পেছনে বিশেষ তাৎপর্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। রাতের অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি যখন নীল আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে, তখন অন্ধকারের মধ্যে

www.pathagar.com

তারকাগুলোর সেই ঝাপসা আলোতে চারিদিকের জিনিসপত্র স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। তখন এই আলো-আঁধারে বিভিন্ন জিনিসের আকার-আকৃতি দেখে সেসব বিষয়ে বিভ্রান্ত এবং ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া অমুলক নয়। যেমন, ধরুন-অন্ধকারে খনিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাছকে ভুত মনে করা যেতে পারে। আবার মাটির উপর পড়ে থাকা একটা রশি বা দড়িকে সাপ মনে হতে পারে। বালুর স্তুপের উপর কোনো পাথর উঁচু হয়ে থাকতে দেখে তাকে কোনো বিরাট জন্তু বসে আছে মনে হতে পারে। কিন্তু তারকাসমূহ যখন ডুবে যায় এবং ভোরের উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত হয়, তখন প্রত্যেকটা জিনিস তার নিজ নিজ রূপ নিয়ে প্রত্যেকটি লোকের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন কোনো জিনিস বা বস্তুর সঠিক রূপ বা আকার আকৃতির বিষয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। অতএব হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের মাঝে বসবাসকারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যাপারটিও ঠিক এরূপ। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব কোনো কিছুই অন্ধকারে নিমজ্জিত নয়। তা সকাল বেলার আলোর মতই উজ্জ্বল ও সর্বজন বিদিত।

তোমরা তো নিশ্চিত জান যে, তোমাদের এই সাহেব বা সঙ্গী-সাথী একজন অত্যন্ত ভদ্র লোক, শান্তশিষ্ট এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি গোমরাহ হয়ে গেছেন, তোমাদের মনের মধ্যে এরূপ ভুল ধারণা কি করে সৃষ্টি হতে পারে? তিনি যে অত্যন্ত সত্যবাদী মানুষ তাও তোমাদের পরীক্ষা করা আছে। তাহলে তিনি জেনে-বুঝে কিভাবে নিজে বাঁকা পথে চলতে পারেন এবং অন্যদেরকেও বাঁকা পথে চলার আহবান জানাতে পারেন, এধরনের কথা ও চিন্তা তোমাদের মনের মধ্যে কিভাবে স্থান করে নিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে তোমরাই ঘোর অন্ধকারে এবং বিভ্রান্তিতে রয়েছো।

কাফিরদের মনে মুহাম্মদ (সঃ) মিথ্যা রচনা করেন বলে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিলো তার উত্তরে মহান আল্লাহ তা'লা পরবর্তী আয়াতে বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ० اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوْحٰى

তিনি নিজের মনগড়া কথাও বলেন না। এটা তো একটা ওহী, যা তাঁর প্রতি নাযিল হয়।

www.pathagar.com

অর্থাৎ যেসব কথার কারণে তিনি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন বলে তোমরা অভিযোগ উত্থাপন করছো, তা তো তিনি নিজে রচনা করে মনগড়া ভাবে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছেন, এটা কোনো দিন-ই কোনো কাল-ই হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যা বলেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া কথাই তোমাদেরকে বলে থাকেন। তিনি তো নবী হওয়ার জন্য কোনো সময়ের জন্যই দাবী করেননি এবং মনের খায়েশও তোমাদের কাছে কখনো কোনো সময়ের জন্য পেশ করেননি। বরং আল্লাহই যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করে তাঁকে এই দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করলেন, ঠিক তখনই তিনি তোমাদের মাঝে 'রিসালাত' প্রচার করতে শুরু করলেন। সুতরাং তিনি যা কিছুই বলেন, তা সবই আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। (তাফহীমূল কুরআন)

ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁর কোনো কথা ও আদেশ তাঁর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হয় না। বরং আল্লাহ তা'লা তাঁকে যে বিষয়ের তাবলীগ বা প্রচারের নির্দেশ করেন তাই তিনি তার মুখ দিয়ে বের করেন। সেখান থেকে যা কিছু বলা হয়, সেটাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও হুকুমের কম বেশী করা হতে তাঁর জবান পবিত্র। ওহী লেখক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। অতঃপর কুরাইশের লোকেরা আমাকে একাজ করতে নিষেধ করে বললো, তুমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যা শুনছো তার সবই লিখে নিচ্ছো অথচ তিনি তো একজন মানুষ। তিনি কখনো কখনো রাগের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন? আমি তখন লিখা হতে বিরত থাকলাম এবং রাসূলল্লাহর (সঃ) নিকট একথা উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমাকে বললেন, তুমি আমার কথাগুলো লিখতে থাকো। আল্লাহর শপথ! সত্য কথা ছাড়া আমার মুখ দিয়ে অন্য কোনো কথা বের হয় না।

(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে আবী শায়বা)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে আমি তোমাদেরকে যে খবর দিয়ে থাকি তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)

www.pathagar.com

বলেছেনঃ আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না। তখন একজন সাহাবী তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো আমাদের সাথে রসিকতা করে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তখনও আমি সত্য কথাই বলে থাকি। (অর্থাৎ রসিকতার সময়েও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয় না)। (ইমাম আহমাদ)
উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সত্যবাদিতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াত দু'টিতে মুহাম্মদ (সঃ) কে শিক্ষাদানকারী জিবরাঈল (আঃ) এর প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝ ذُوْمِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى

তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফিরিশতা, যে বড় কৌশলী। সে নিজ আকৃতিতে সামনে এসে দাঁড়ালো।

এই আয়াত দু'টিতে কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, হে লোকেরা! তোমরা যা মনে করছো তা নয়, কোনো মানুষ মুহাম্মদ (সঃ) কে কোনো কিছুই শিক্ষা দেয় না। বরং তাঁকে যা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মহাশক্তিশালী, কৌশলী ও বিচক্ষণ ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) এর দ্বারাই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

شَدِيْدُ الْقُوٰى - 'মহাশক্তিশালী' বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে ? ঃ

মহাশক্তিশালী বা মহাশক্তিধর বলতে কেউ কেউ মনে করেছেন যে, এই বাক্য দ্বারা মহান আল্লাহ তা'লার সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকারকদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এই কথাটি দ্বারা ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং কাতাদাহ, মুজাহীদ ও রুবাই ইবনে আনাস (রহ) হতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরকারক ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, রাজী ও আ-লুসী প্রমুখ এ কথাটিকেই গ্রহণ করেছেন। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তাঁদের আপন আপন তাফসীরে এ কথারই অনুসরণ করেছেন।

www.pathagar.com

প্রকৃত কথা হলো এই যে, পবিত্র আল কুরআনের অন্যান্য আয়াতের স্পষ্ট ঘোষণা হতে এ কথাটিরই প্রমাণিত হয়।

যেমন, সূরা আত্তাকভীর-এ মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝

"নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী, যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট বড় মর্যাদাসম্পন্ন, যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসযোগ্য।" (আয়াত নং-১৯-২১)

এই আয়াতেও বলা হয়েছে যে, তিনি বার্তাবাহক ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ), যিনি শক্তিশালী।

সূরা আল বাকারার ৯৭ নং আয়াতে ফিরিশতার নামও বলে দেয়া হয়েছে- যেমন বলা হয়েছে-

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়। কেননা, তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন।"

সুতরাং এসব আয়াত কয়টি যদি সূরা 'আন্-নাজম' এর এই আয়াতের সাথে একত্রিত করে পাঠ করা হয়, তাহলে এখানে 'মহাশক্তিশালী শিক্ষাদাতা' বলতে যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কেই বুঝানো হয়েছে- আল্লাহ তা'লাকে নয়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) কি রাসূল (সঃ) এর শিক্ষক হতে পারেন? ঃ

রাসূল (সঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন এক মহাশক্তিশালী ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ)। এই কথার দ্বারা কেউ কেউ সংশয়পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারেন যে, জিবরাঈল (আঃ) কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর শিক্ষক হতে পারেন? তাঁর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, তিনি ওস্তাদ আর নবী করীম (সঃ) ছাত্র। এতে কি রাসূল (সঃ) এর তুলনায় জিবরাঈল (আঃ) এর মর্যাদা বেশী হয়ে যায় না? উত্তরে বলা যায় যে, এই সংশয় ও প্রশ্ন ভিত্তিহীন। কেননা, জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিজস্ব কোনো ইলম বা জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে শিক্ষা

www.pathagar.com

দিতেন না। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত ইলম পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি জ্ঞান দানের শুধু মাধ্যম হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে তাঁর শিক্ষক ছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে নয়। কাজেই রাসূলের উপর জিবরাঈল (আঃ) মর্যাদাবান হওয়ার কোনো কথা প্রমাণিত হয় না। তিনি যদি নিজস্ব ইলম তাঁকে শিখাতেন, তাহলেই একথা বলা যেতো।

যেমন, একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে- সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, তিরমিজী ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক সহ বিভিন্ন কিতাবে বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সাঃ) কে সালাতের সঠিক সময় ও নিয়ম শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে পাঠালেন। তিনি পরপর দুই দিন তাকে পাঁচ পাঁচ করে দশ ওয়াক্ত সালাত পড়ালেন। প্রথম দিন প্রথম ওয়াক্তে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করলেন, আর দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করলেন। এ বিষয়ে রাসূল (সঃ) নিজে বলেন যে, তিনি ছিলেন মুক্তাদী, আর জিবরাঈল (আঃ) ইমাম হিসেবে সালাত পড়িয়েছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র সালাতের সময় ও পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে জিবরাঈল (আঃ) কে ইমাম বানিয়ে দেয়ার কারণে তিনি রাসূল (সঃ) এর তুলনায় বেশী মর্যাদাবান হয়ে গিয়েছেন এমন কথা বলা যায় না।

সুতরাং এসব বর্ণনা থেকে আমাদেরকে এটাই বুঝে নিতে হবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রকৃত শিক্ষাদাতা ছিলেন মহান আল্লাহ্ তা'লা। আর হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন মাধ্যম মাত্র।

ذُوْ مِرَّةٍ -এর অর্থঃ ذُوْ مِرَّةٍ এর অনুবাদের সময় 'কৌশলী', 'প্রজ্ঞাসম্পন্ন' করেছি। কিন্তু বিভিন্ন জন এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (রাঃ) এর অর্থ করেছেন- সৌন্দর্য মন্ডিত, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ।

মুজাহীদ, হাসান বসরী, ইবনে যায়দ ও সুফিয়ান সওরী এর অর্থে বলেছেন- শক্তিমান।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এর মতে এর অর্থ-প্রজ্ঞা ও কলা-কৌশল সম্পন্ন।

www.pathagar.com

আরবী কথনে ذُوْمِرَّةٍ শব্দটি খুবই স্পষ্ট, যথার্থ ও নির্ভুল মতদান ক্ষমতা সম্পন্ন, বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, বিবেকবান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা এখানে জিবরাঈল (আঃ) সম্পর্কে এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক উভয় দিকে যাবতীয় শক্তি সামর্থ পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান রয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন)

فَاسْتَوٰى - এর অর্থ- **সোজা হয়ে গেলেন বা সামনে এসে দাঁড়ালেন।**

উদ্দেশ্য হলো এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জিবরাঈল (আঃ) যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করছিলেন। অর্থাৎ আকাশ থেকে অবতরণ করে নবী করীম (সঃ) এর সামনে স্ব আকৃতিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

জিবরাঈল (আঃ) আকাশ থেকে কোথায় অবতরণ করেছিলেন, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى **এবং তখন সে উর্দ্ধ দিগন্তে অবস্থিত ছিলো।**

وَفُقِ الْاَعْلٰى - 'উর্দ্ধ দিগন্ত'। এখানে দিগন্তের সাথে উর্দ্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে। 'দিগন্ত' আকাশের পূর্ব কোন্, যেখান থেকে সূর্য উদয় হয় ও দিনের আলো ফুটে উঠে ও ছড়িয়ে পড়ে। উভয় আয়াত হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রথমবার যখন নবী করীম (সঃ) জিবরাঈল (আঃ) কে দেখতে পান, তখন তিনি আকাশের পূর্ব কোন্ হতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অনেকগুলো গ্রহণযোগ্য হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এই সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর আসল আকার আকৃতিতে বিদ্যমান ছিলেন, যেই আকৃতিতে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন।

ইমাম আহমদে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে তাঁর আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শটি পালক ছিলো। এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিলো যে, আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছিলো। আর ওগুলো হতে পান্না ও মনিমুক্তা ঝরে পড়ছিলো। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

ইবনে কাসীরে আরও উল্লেখ রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে তাঁর আসল চেহারায় দেখার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানান। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন, আপনি এজন্য আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করলে দেখতে পান যে, কি একটা জিনিস উঁচু হয়ে উঠছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। এটা দেখেই তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দেন ও তাঁর মুখের থুথু মুছিয়ে দেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে মুহাম্মদ (সঃ) থেকে জিবরাঈল (আঃ) কতটুকু দুরে অবস্থান করছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

অতঃপর সে তাঁর নিকটবর্তী হলো এবং উপরে ঝুলে থাকলো, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা তার চেয়েও কম।

دَنَا শব্দের অর্থ- নিকটবর্তী হলো, আর تَدَلّٰى শব্দের অর্থ- ঝুলে গেল। অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) আকাশের উর্দ্ধে পূর্ব দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করার পর রাসূলে করীম (সঃ) এর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। অগ্রসর হতে হতে তিনি তাঁর উপর এসে শুন্যে ঝুলে থাকলেন। পরে তিনি নবী করীম (সঃ) এর দিকে ঝুঁকেন এবং ঝুঁকতে ঝুঁকতে এতোটা নিকটবর্তী হয়ে গেলেন যে, তাঁদের উভয়ের মাঝে দুই ধনুকের সমান কিম্বা তার চেয়েও কম দূরত্ব থাকলো।

قَابَ قَوْسَيْنِ ব্যাক্যের অর্থ- তাফসীরকারকগণ সাধারণত "দুই ধনুক পরিমান" অর্থ করেছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) قَوْسَيْنِ এর অর্থ 'হাত' করেছেন। আর كَانَ كَابَ قَوْسَيْنِ এর তাৎপর্যে বলেছেন, উভয়ের মাঝে কেবল দুই হাতের দূরত্ব ছিলো। ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

দুই ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়েও কম এরূপ বলায় কারো মনে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ বুঝি দূরত্বের পরিমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংশয়ের মধ্যে পড়েছিলেন, (নাউযুবিল্লাহ্) তা কিন্তু নয়। এটা একটা বাচনভঙ্গী। (তাফহীমুল কুরআন)

قَابَ قَوْسَيْنِ 'দুই ধনুকের মধ্যবর্তী' ব্যবধান বলার কারণ এই যে, আরব বাসীদের একটা অভ্যাস ছিলো, দুই ব্যক্তির মধ্যে শান্তিচুক্তি বা সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত আলামত ছিলো হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিলো এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সুতা বা দড়ি অপরের দিকে রাখতো। এভাবে উভয় ধনুকের সুতা পরস্পরের মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার আলামত বা ঘোষণা মনে করা হতো। এসময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেতো, অর্থাৎ দুই হাত বা এক গজ। এরপর اَوْ اَدْنٰى বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণত প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিলো, বরং এর চেয়েও কম।

আলোচ্য আয়াতে জিবরাঈল (আঃ) এর খুব কাছাকাছি হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এই দিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌছিয়েছেন তা শ্রবণে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আঃ)-কে নাচেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়। (মা'রিফুল কুরআন)
ইবনে কাসীর উল্লেখ করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে দেখেছিলাম, তাঁর ছয়শটি পাখা ছিলো।"

(হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন)

জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সঃ) এর নিকটবর্তী হয়ে কি করলেন, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে বলেন-

www.pathagar.com

فَـــاَوْحٰى اِلٰى عَبْـــدِهٖ مَـــااَوْحٰى -তখন সে আল্লাহর বান্দাহকে ওহী পৌঁছালো, যে ওহী-ই পৌঁছানোর ছিলো।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَـــااَوْحٰى এই বাক্যটির দু'ধরনের অর্থ হতে পারে। একটি হলো এইঃ "তিনি ওহী পাঠালেন তাঁর বান্দাহর প্রতি যা কিছুই ওহী পাঠালেন।" আর দ্বিতীয় অর্থ হলো এরূপঃ "তিনি ওহী পাঠালেন নিজের বান্দাহর প্রতি যা কিছুই ওহী করলেন।"

প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতের বক্তব্য হয় এরূপঃ 'জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাহর প্রতি ওহী দিলেন, তাঁর ওহী দেয়ার যা কিছু ছিলো।' আর দ্বিতীয় অর্থে আয়াতের বক্তব্য হবে এরূপঃ 'আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাহর নিকট ওহী করলেন যা কিছুই তাঁর ওহী করার ছিলো।' তাফসীরকারকগণ এই উভয় প্রকার অর্থই সঠিক বলেছেন। কিন্তু পূর্বাপরের দৃষ্টিতে প্রথম অর্থ-ই বেশী যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে যায়েদ হতে এই তাফসীর-ই বর্ণিত হয়েছে।

(তাফহীমুল কুরআন)

উপরের আলোচনায় বুঝা যায় যে, عَبْـــدِهٖ 'তাঁর বান্দাহর' এই 'ه' সর্বনামটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ এর অর্থ হয়, 'জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাহর প্রতি ওহী করলেন।' কিংবা 'জিবরাঈলের মাধ্যমে নিজের বান্দাহর প্রতি ওহী করলেন।'

সে ওহীটি কি ছিলো? ঃ ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন যে, সে সময়ের ওহী ছিলো আল্লাহ তা'লার এই উক্তিগুলো ঃ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَـــاٰوٰى ঃ অর্থাৎ "তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি?" (সূরা যোহা-৬) এবং وَرَفَعْنَالَـــكَ ذِكْـــرَكَ "আর আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি।"(সূরা ইনশিরাহ-৪)

অন্য কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'লা ঐ সময় নবী (সঃ) এর প্রতি ওহী করেনঃ "নবীদের উপর জান্নাত হারাম যে পর্যন্ত না তুমি তাতে প্রবেশ করো এবং উম্মতের উপর জান্নাত হারাম যে পর্যন্ত না তোমার উম্মত তাতে প্রবেশ করে।"

www.pathagar.com

পরবর্তী আয়াতে নবী করীমের (সঃ) জিবরাঈলকে দেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন-

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى ۝ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى

রাসূলের অন্তর তা মিথ্যা বলেনি যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এখন কি তোমরা সেই বিষয়ে বিতর্ক করো-যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন?

فُؤَادُ শব্দের অর্থ- 'দিল' বা 'অন্তর'। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, চোখ যা কিছু দেখেছে দিল বা অন্তর তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোনো ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كَذَبَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তর মিথ্যা বলেনি।

مَارَاٰى শব্দের অর্থ- 'যা কিছু দেখেছে।' কিন্তু কি দেখেছে, আল কুরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরকারগণের উক্তি দু'রকমের। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ তা'লাকে দেখেছেন এবং কারও কারও মতে জিবরাঈল (আঃ) কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। এই তাফসীর অনুযায়ী رَاٰى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে চর্মচক্ষে দেখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তঃচক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেয়া নিশ্প্রয়োজন। সুতরাং رَاٰى অর্থাৎ চর্মচক্ষে দেখেছেন দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কেই দেখেছেন।

আয়াতে অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করতে হলে বোধশক্তি থাকতে হবে। এই প্রশ্নের জবাব এই যে, আল কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্রস্থল হলো দিল বা অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকে قَلْبٌ (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন- لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ আয়াতে 'কলব' বলে বিবেক ও বোধশক্তি বুঝানো হয়েছে। আল কুরআনের لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ইত্যাদি আয়াতের পক্ষে স্বাক্ষ্য দেয়। (মা'রিফুল কুরআন)

www.pathagar.com

আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে বলেন- আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমবার তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে 'সিদরাতুন মুনতাহার' নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যামানায় হয়েছিলো। তখন জিবরাঈল (আঃ) সূরা ইকরার প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিদারুন উৎকণ্ঠা ও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন কি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তখনই জিবরাঈল (আঃ) আড়াল থেকে আওয়াজ দিয়ে বলতেন ঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি তো আল্লাহর সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যেতো। এভাবে তাঁর মনে যখনই বিরূপ কল্পনা দেখা দিতো, তখনই জিবরাঈল (আঃ) অদৃশ্য থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাকে সান্তনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আঃ) মক্কায় খোলা মাঠে তাঁর আসল আকৃতিতে আগমন করলেন। তাঁর ছয়শত বাহু ছিলো এবং তিনি গোটা দিগন্তকে তাঁর বাহু দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌছান। তখন রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম এবং আল্লাহ তা'লার দরবারে তাঁর উচ্চমর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে। সারকথা এই যে, ইবনে কাসীরের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হলো, এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিলো।

কোনো কোনো বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আঃ) কে দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

www.pathagar.com

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ٥ عِنْدَ سِدْ رَةِ الْمُنْتَهٰى٥عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى

আর অবশ্যই তাঁকে আরেকবার দেখেছেন, 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকটে, যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা-ওয়া।

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জিবরাঈল (আঃ) কে আরো একবার আসল রূপে দেখেছিলেন 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকটে, যেখানে জান্নাতুল মা-ওয়া অবস্থিত।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁকে বলতে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং মুফাস্‌সীরদের অভিমত হলো, তাঁকে বলতে জিবরাঈল (আঃ) কে বলা হয়েছে। (এ বিষয়ে ইবনে কাসীর এবং মা'রিফুল কুরআনে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে)

نَزْلَـــةً اُخْـــرٰى এর অর্থ- 'দ্বিতীয়বার অবতরণ'। জিবরাঈল (আঃ) কে দেখার বিষয়ে যেমন প্রথম অবতরণের স্থান মক্কার উর্দ্ধ দিগন্ত বলা হয়েছে, তেমনি এখানে দ্বিতীয়বার দেখার স্থান হিসেবে 'সিদরাতুল মুনতাহার' কথা বলা হয়েছে।

সকলের জানা কথা যে, মি'রাজের রাতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। সুতরাং জিবরাঈলকে দ্বিতীয়বার দেখার সময়টাও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

سِـــدْرَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'বদরিকা বৃক্ষ' বা 'বরই' বা 'কুল গাছ'।

আর مُنْتَهٰى শব্দের আভিধানিক অর্থ- 'শেষ প্রান্ত'। সপ্ত আকাশে আরশের নীচে এই 'বদরিকা বৃক্ষ' বা 'কুল গাছ' অবস্থিত।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার এভাবে সমন্বয় হতে পারে যে, এই গাছের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং এর শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। (কুরতুবী)

সাধারণ ফিরিশতাদের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুনতাহা বা শেষ প্রান্ত বলা হয়।

www.pathagar.com

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'লার বিধানসমূহ প্রথমে 'সিদরাতুল মুনতাহায়' নাযিল হয়, তারপর এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফিরিশতাগণের নিকট সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আ'মলনামা ইত্যাদিও ফিরিশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান থেকে অন্য কোনো পন্থায় আল্লাহ তা'লার দরবারে পেশ করা হয়। মুসনাদ-ই আহমদে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে একথায় বর্ণিত আছে।

(ইবনে কাসীর)

আল্লামা আলুসী তাঁর রূহুল মায়া'নী তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

اليها ينتهى عالم كل عالم وما وراها لا يعلمه الا الله

অর্থাৎ "এখানেই সকল জগতের জ্ঞান শেষ ও পরিসমাপ্ত। এর অপর পারে যা কিছু আছে, সেই বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কিছুই জানে না।" (তাফহীমূল কুরআন)

অতঃপর আল্লাহ তা'লা 'সিদরাতুল মুনতাহার' অবস্থান সম্পর্কে আরো নিশ্চিত করে বলেন যে,

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوٰى "যার নিকট জান্নাতুল মা-ওয়া অবস্থিত।"

مَاوٰى শব্দের অর্থ- 'ঠিকানা' বা 'বিশ্রামস্থল'। জান্নাতকে مَاوٰى (মা-ওয়া) বলার কারণ হলো এই যে, এটাই মানুষের আসল এবং শেষ ঠিকানা। আদম (আঃ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

(মা'রিফুল কুরআন)

'জান্নাতুল মা-ওয়া' সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী বলেছেন, এটা সেই জান্নাত যা পরকালে ঈমান ও তাকওয়াবান লোকদেরকে দেয়া হবে। এই আয়াতে দলীল হিসেবে পেশ করে তিনি এও বলেছেন যে, এই জান্নাত আকাশ মন্ডলে রয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এটা সেই জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহ সংরক্ষিত হয়। এটা সেই জান্নাত নয়, যা পরকালে পাওয়া যাবে। হযরত ইবনে আব্বাসও এ কথাই বলেছেন। তিনি আরও একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, পরকালে ঈমানদার লোকদেরকে যে জান্নাত দেয়া হবে তা আকাশ মন্ডলে নয়, ওর স্থান এই পৃথিবীতে। (তাফহীমুল কুরআন)

www.pathagar.com

শিক্ষাঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নাজম এর প্রথম ১৫টি আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় রয়েছে তা হলোঃ

১. আকাশের তারকারাজি অস্তমিত হয়ে যেভাবে রাতের আলো-আঁধার কেটে দিনের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস স্বরূপে পরিস্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, অনুরূপভাবে রাসূল (সঃ) এর স্বভাব-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, জীবন ও ব্যক্তিত্ব সকাল বেলার উজ্জ্বল আলোর মতই স্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত।

২. মুহাম্মদ (সঃ) নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে আল্লাহ, রাসূল, ওহী এবং ওহী বাহক জীবরাঈল ও আখিরাত সম্পর্কে যেসব বক্তব্য পেশ করেছেন, সে বিষয়ে যেমন কোনো ভাবেই কুরাইশ কাফিরদের মতো তাঁকে বিভ্রান্ত বা বিপদগামী বলে মন্তব্য করা যাবে না, তেমনি মনের মধ্যেও এ বিষয়ে সামান্যতম ধারণাও পোষণ করা যাবে না।

৩. নবী মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছুই বলেন, তা তাঁর নিজস্ব মনগড়া কোনো কথা নয়, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নাযিল কৃত ওহী বা প্রত্যাদেশ।

৪. নবী করীম (সঃ) কে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মাধ্যম হিসেবে যাকে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি তো কোনো সাধারণ ফিরিশতা নন, বরং তিনি একজন মহাশক্তিশালী, কৌশলী ও বিচক্ষণ ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ), যার ছয়শত বাহুবিশিষ্ট দেহ যা আসমান যমীনের দিগন্তকে ঢেকে ফেলে।

৫. এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নবী করীম (সঃ) এর নিকট যে ফিরিশতা ওহী নিয়ে এসেছেন, তাঁকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ওহী তিনি নিয়ে এসেছেন তা নিয়ে বিতর্ক করা বা সন্দেহ পোষণ করা কোনো মুমিন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যদি কেউ তা নিয়ে বিতর্ক বা সন্দেহ পোষণ করে তবে তা হবে কুরাইশ কাফিরদের অনুরূপ আ'মল।

৬. এও বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) কে আসলরূপে দু'বার দেখেছেন। একবার হলো নবুওয়াতের

www.pathagar.com

প্রাথমিক যুগে মক্কার খোলা মাঠে। আর একবার দেখেছেন মি'রাজের রাতে 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা কুল গাছের নিকট যেখানে জান্নাতুল মা-ওয়া অবস্থিত। সেখানে জান্নাতিদের রূহ অবস্থান করে।

৭. সর্বোপরি একজন খাঁটি মুমিনকে যেমন শিরকমুক্ত তাওহীদে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে, তেমনি রিসালাতের বিষয়েও পূর্ণ ও সংশয়মুক্ত বিশ্বাসী হতে হবে। অর্থাৎ নবী , ওহী বা কিতাব এবং ফিরিশতা এই তিনের সমম্বয়ে 'রিসালাত'। সুতরাং এর প্রত্যেকটিতে পূর্ণ এবং সংশয়মুক্ত বিশ্বাসী হতে হবে।

আহ্বানঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আন্ নাজম এর প্রথম ১৫টি আয়াতের যে দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'লার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা সূরা আন্ নাজমের এই অংশ থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বিশ্বাসে ও আ'মলে পূর্ণ মুমিন হতে পারি, মহান আল্লাহ্র কাছে সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। "অয়া আখিরুদাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন"।

———— ০ ————

লেখকের প্রকাশীত অন্যান্য বই

দারসে হাদীস ১ম খন্ড
দারসে হাদীস ২য় খন্ড
দারসে কুরআন ১ম খন্ড
দারসে কুরআন ২য় খন্ড
দারসে কুরআন ৩য় খন্ড
দারসে কুরআন ৪র্থ খন্ড
দারসে কুরআন ৫ম খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্মসূচী
ফাযায়িলে ইকামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রুহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

www.pathagar.com